নারীর ক্ষমতায়ন :
বিবিধ প্রবণতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা

আইনুন নাহার ও আবু আলা মাহমুদুল হাসান

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বর্তমানে অষ্টম স্থানে থাকা দেশ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর থেকেই নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশ, যেখানে জনগণের বৃহত্তর অংশই এখনো গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তারা বহুকাল ধরে কিছু দুরূহ প্রবণতার মোকাবেলা করে আসছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘনবসতি ও উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ব্যাপক দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, অনুন্নত অবকাঠামো, মৌলিক সেবাসমূহের অপ্রতুলতা, নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে দেশের অগ্রগতিও ঘটে চলেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নানাভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় সম্পৃক্ত হয়েছে; যেমন, দেশটি মধ্যপ্রাচ্যসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলের অভিবাসী শ্রমিকের প্রধান উৎস। এ ছাড়া, দেশটি বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্পেরও অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক, যে শিল্প দাঁড়িয়ে আছে মূলত নারীশ্রমের ওপর। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর দেশটির কাঁধে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে যে বদনাম চাপানো হয়েছিল, বহু আগেই তা ঝেড়ে ফেলার পর জুলাই ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক ঘোষিত একটি তালিকা অনুসারে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্যম আয়ের একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি বাংলাদেশ আরো কয়েকটি কারণেও আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট মনোযোগ কেড়েছে। এগুলোর একটি হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালিত নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। টিকাদানের মতো কর্মসূচি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রঋণ, মৌলিক শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি খাতে অনেক প্রকল্প যথেষ্ট সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। অধিকন্তু বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, বিশেষ করে বহু দেশি ও বিদেশি এনজিও, দীর্ঘদিন ধরে নানা কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনজিওগুলো তাদের বিবিধ কার্যক্রমের জন্য প্রশংসিত হলেও নানা কারণে সমালোচিতও হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এমনকি সহিংস বাধার মুখেও পড়েছে; যেমন, বৈদেশিক অনুদাননির্ভর এনজিওগুলোকে বাম রাজনৈতিক মহলে অনেকেই শুরু থেকেই 'সাম্রাজ্যবাদের দোসর' হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছিল। আবার পরে এক সময় দেশের কিছু মহলে তাদের 'ইসলামবিরোধী শক্তি' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল বিরোধীদের আপত্তির একটা প্রধান জায়গা (নাহার ২০০৮)।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) ১৯৮৬ সাল থেকে প্রান্তিক মানুষ, বিশেষত নারীসমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় সম্পন্ন এ সংগঠনটির মূল কর্মএলাকা হলো ঢাকা, নেত্রকোনা ও চট্টগ্রাম জেলায়।

মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সংগঠনটি জাতীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও কাজ করে। এভাবে কাজ করার কৌশলগত লক্ষ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ের বিবিধ অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নিয়ে আসা। বিএনপিএস তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রান্তিক জনগণের, বিশেষত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সচেতনতা ও বিশ্লেষণী দক্ষতা বৃদ্ধি, আয়মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা ইত্যাদি।

বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিএনপিএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পের দুটি হলো প্রোমোটিং রাইটস থ্রু মোবিলাইজেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (প্রাইম) এবং অ্যাডভান্সিং ইক্যুয়ালিটি অব ওমেন অ্যান্ড মার্জিনালাইজড পিপল (আওয়াম), যেগুলোর বর্তমান পর্ব শুরু হয় জুলাই ২০১৫ সালে এবং চলবে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। এই প্রকল্প দুটির আওতায়ই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে বর্তমান গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে দেখা হয়েছে প্রকল্প দুটির কর্মএলাকায় নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রবণতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় এবং সেগুলোর প্রেক্ষিতে তাদের কার্যক্রম কী ধরনের ভূমিকা রাখছে বা আগামীতে রাখতে পারে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ অনুসন্ধান করা এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা অনুধাবন করা। তবে এসব বিষয়কে সামনে রেখে বিএনপিএস-এর দুটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় মাঠকর্ম বাস্তবায়ন করা হলেও গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল প্রকল্প দুটির কার্যক্রমের ওপরই নজর সীমিত রাখা হয় নি। এই পন্থা অনুসৃত হয়েছে এই কারণে যে, গবেষণাকর্মটি কোনো গতানুগতিক প্রকল্প মূল্যায়নের কাজ ছিল না। বরং সেটির মাধ্যমে দেখতে চাওয়া হয়েছে বিদ্যমান বাস্তবতা ও বিবিধ প্রবণতার আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের কাজে আগামীতে আরো কার্যকর সহায়তা দেওয়ার পন্থা ও কৌশল সাধারণভাবে কী হতে পারে।

গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে দেখবার বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

- নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের স্বরূপ বোঝা। অর্থাৎ, কী ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী যুক্ত এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কতটা বেড়েছে তা দেখা;
- তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা বোঝা;
- ঘরে-বাইরে, পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনপরিসরে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের স্বরূপ অনুধাবন করা;
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিসরে নারীর ক্ষমতায়নের বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত বাধা দূরীকরণের সম্ভাব্য পন্থা নিরূপণ করা; এবং
- নীতিনির্ধারণী পর্যায়সহ বিভিন্ন পরিসরে করণীয় নিরূপণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা ও সুপারিশসমূহ চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি ছিল মূলত মাঠকর্মভিত্তিক গবেষণা। এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ঢাকা, নেত্রকোনা, বারহাট্টা, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে, যেসব জায়গায় বিএনপিএস দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে আসছে। উল্লেখ্য, সংগঠনটির প্রধান দুটি প্রকল্পের মধ্যে প্রাইম কার্যকর রয়েছে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে এবং আওয়াম বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা, নেত্রকোনা ও বারহাট্টায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাঠগবেষণা পরিচালিত হয়েছে শহুরে বস্তি ও নিম্ন আয়ের মানুষদের বসতি এলাকায়; নেত্রকোনায় শহরের উপকণ্ঠের বস্তি ও গ্রাম উভয় ধরনের এলাকায় আর বারহাট্টা ও সন্দ্বীপে কেবল গ্রামপর্যায়েই গবেষণা চালানো হয়েছে।

উল্লিখিত এলাকাসমূহে বিএনপিএস-এর যে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাইম ২০০৮-এ শুরু হওয়ার পর বর্তমানে তৃতীয় পর্বে রয়েছে। অন্য প্রকল্প আওয়াম ২০১৫-এ শুরু হলেও আগে ওই এলাকাগুলোও প্রাইম প্রকল্পের কর্মএলাকাভুক্ত ছিল। আলাদা ভৌগোলিক এলাকায় বাস্তবায়নাধীন এই সমরূপ প্রকল্প দুটির লক্ষ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত স্থানীয় জনগণের, বিশেষ করে নারীদের, আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যসমূহ হলো : ১. ধারণাগত স্পষ্টতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও উপস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদির প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারী ও তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা; ২. ক্ষমতায়ন সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে আরো দায়বদ্ধ করা, বিশেষত নারী ও জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য লাঘবের প্রতি দৃষ্টি রেখে।

প্রকল্প দুটির প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল বিভিন্ন দলের সাথে (যেমন নারী, তরুণ বা পুরুষদের নিয়ে গঠিত প্রকল্পসংশ্লিষ্ট দল, কমিউনিটি ফোরাম ইত্যাদি) নিয়মিত সভার আয়োজন করা, তাদের মধ্যে সচেতনতা ও বিবিধ দক্ষতা তৈরি করা। একেকটা নারী দলে ২০-২২ জন করে সদস্য রয়েছেন। তাদের স্বামীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে পুরুষ দল। এ ছাড়া, উঠতি বয়সী নারী ও পুরুষদের দলও রয়েছে, যাদের মধ্যে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি স্কুলের বাইরের তরুণ-তরুণীরাও রয়েছে। এ ধরনের দলের বেলায় বয়সসীমা সেভাবে মানা হয় নি। বিভিন্ন নারী দলের সমন্বয়ে ক্লাস্টার পর্যায়ের কমিটি রয়েছে এবং একাধিক ক্লাস্টারের নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিদের নিয়ে রয়েছে কমিউনিটি ফোরাম। এই ফোরামসমূহ বিভিন্ন দল ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্প দুটি স্থানীয় সরকারে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যেও কাজ করছে। এ ধরনের যত কর্মকাণ্ড রয়েছে, সবগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের কাছ থেকেই মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় ছিল ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এবং এক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলগুলোর মধ্যে ছিল সাক্ষাৎকার, এফজিডি বা দলীয় আলোচনা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। সর্বমোট ২৫টি দলীয় আলোচনা এবং ১৬টি নিবিড় সাক্ষাৎকার সম্পাদন করা হয়েছে। দলীয় আলোচনায় গড়ে ১০ থেকে ১৪ জন করে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ২২ পর্যন্তও হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে কমিউনিটি ফোরাম ও তরুণ দলের বেলায় নারী ও পুরুষের মিশ্র দল ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্থানীয় দলের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় জনসমাজের সদস্যবর্গ, প্রকল্পের

কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি প্রমুখ ছিলেন তথ্যের প্রধান উৎস। এ ছাড়াও, প্রকল্পের সাথে যুক্ত নানা প্রতিবেদন ও দলিলপত্র এবং সেসবের বাইরে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সাহিত্যও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার পরিধি ব্যাপক ছিল, যার আওতায় নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল মাত্রাই দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তা ছাড়া, তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো স্থানেই মাঠকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। সেদিক থেকে বরাদ্দকৃত সময় ও সম্পদের মধ্যে অনেক বিষয় খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সুযোগ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্যদাতারা বিএনপিএস কর্মীদের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়েছিল। তবে কাজটি প্রায়ই অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা হয়েছিল বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই। এ ছাড়া, তথ্যদাতাদের অনেকে বিএনপিএস-এর প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পেও জড়িত ছিল। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বুঝে ওঠা মুশকিল ছিল যে তারা কোন প্রকল্পের কার্যক্রমের কথা বলছিল।

গবেষণার তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো

যে কোনো সামাজিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো। এই বিবেচনায় নিচে আমরা সংক্ষেপে দেখব বর্তমান গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়ন বলতে ধারণাগতভাবে কী বোঝানো হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান সাহিত্য থেকে কী ধরনের তাত্ত্বিক বিষয়াদি প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের ধারণায়ন

ব্যাপক ব্যবহারের কারণে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির অর্থও অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়ে এর স্পষ্টতা হারিয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের পরিসরে এটি অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ একটি বহুল উচ্চারিত ফাঁপা বুলি বা বাজওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে (বাতলিওয়ালা ২০০৭, কর্নওয়াল ও ইয়াড ২০১১)। এক সময় ক্ষমতায়ন বলতে মূলত বোঝানো হতো তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন লড়াইকে, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল অসম ক্ষমতা সম্পর্কের মুখোমুখি হওয়া ও সেগুলো পালটে দেওয়া। তবে এক পর্যায়ে শব্দটি বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকে শুরু করে বহু বাণিজ্যিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনও শিথিল অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে (কর্নওয়াল ২০১৬)। এভাবে এটির সাধারণ প্রয়োগ বাড়তে থাকে উন্নয়নের পরিসরেও, যেখানে নারীদের ভূমিকা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ও ক্রমশ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল। এটি বিশেষ করে ঘটেছিল ষাট ও সত্তরের দশকের দিকে নারীদের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ নেতিবাচক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। এমন পটভূমিতেই জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দশক (১৯৭৫-৮৫) ঘোষিত হয়েছিল। ততদিনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কেবল আয়মূলক কর্মকাণ্ড নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনে খুব একটা ভূমিকা রাখে না, বরং তা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ওপর আরো বোঝা চাপিয়ে দেয়। এমন উপলব্ধি থেকেই জেন্ডার ও ক্ষমতায়নের সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ বাড়তে থাকে। তবে সেই পটভূমিতে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পর এটির অর্থও শিথিল হতে শুরু

করে, যেখানে অনেকের চোখে এটি সমার্থক হয়ে উঠেছিল স্রেফ জন্মনিরোধকের ব্যবহার বা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মতো কর্মকাণ্ডের সাথে (ইসলাম ২০১৪)।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট অনেকে ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের মতো মৌলিক পদগুলোকে স্পষ্টতরভাবে সংজ্ঞায়িত ও ধারণায়িত করার চেষ্টা করেছেন; যেমন বাতলিওয়ালা ক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন বলতে বুঝিয়েছেন যথাক্রমে 'বস্তুগত সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও মতাদর্শের ওপর নিয়ন্ত্রণ' এবং 'একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় এবং ক্ষমতার উৎসসমূহের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়' (বাতলিওয়ালা ১৯৯৪:১২৯-১৩০)। অবশ্য এমন সংজ্ঞায়নে কাঠামোগত রূপান্তরের বৃহত্তর পর্যায়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতর পরিসরের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নি। এদিক থেকে গীতা সেন বাতলিওয়ালার সংজ্ঞায়নকে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে গিয়ে ক্ষমতার দুটি কেন্দ্রীয় দিকের ওপর জোর দেন, 'সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ (বস্তুগত, মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও আত্মসত্তাগত) এবং নিয়ন্ত্রণ মতাদর্শের ওপর নিয়ন্ত্রণ (বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)'। একই সাথে তিনি 'নিজেকে প্রকাশের সামর্থ্য'কে ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন (সেন ১৯৯৭:২)। একইভাবে কবীরও জোর দিয়েছেন নারীদের নিজেদের বোঝার প্রক্রিয়ার ওপর (কবীর ১৯৯৪)। অন্যদিকে আন্দ্রেয়া কর্নওয়াল ক্ষমতায়নের সম্পর্কগত দিকের ওপর বেশি জোর দিয়ে বলেন, 'নারীবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তি দিয়েছেন যে ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের প্রতি বা তাদের জন্য কোনো কিছু করা বোঝায় না। প্রত্যেক নারী যখন নিজের ভেতরের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অন্য নারীদের সাথে একজোট হয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে শেখে, তখনই তারা স্বাধীন সত্তা হিসেবে চলার ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে যখন তারা অন্যায় ও অসমতার মোকাবেলা করার সমন্বিত প্রয়াসে শামিল হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষমতা' (কর্নওয়াল ২০১৬)। এই প্রেক্ষিতে শলকামির পর্যবেক্ষণও প্রাসঙ্গিক : 'দারিদ্র্য লাঘব করা এবং নারীদের কিছু উপার্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনকে আরো ভালো করে তুলতে সহায়তা করা যায়, যে ধরনের সহায়ক পরিবেশ বিবিধ অধিকারকে নিশ্চিত করে; যেমন, কাজের, সম্পদের, নিরাপদ থাকার বা কথা বলার, যা শুধু সেলাই মেশিন বা ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না' (শলকামি ২০১০:২৫৭)।

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে উঠে আসা কিছু প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক বিষয়

নায়লা কবীর (কবীর ২০১২) তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, নারী-পুরুষের সমতা যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, এমন জোরালো আলামত রয়েছে। নারীদের কর্মসংস্থান ও তাদের হাতে বিত্ত থাকলে পারিবারিক দারিদ্র্য কমে যায় এবং পারিবারিক পরিসরে মানব সম্পদ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে তিনি মনে করেন, স্রেফ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি পায়, এমন কোনো জোরালো প্রমাণ নেই।

ফিরদৌস আজিম ও মাহিন সুলতান সম্পাদিত একটি প্রবন্ধ সংকলন রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে নারীর ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে (আজিম ও সুলতান ২০১০)। সেখানে একটি প্রবন্ধে আমেনা মহসিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে কাঠামোগত ও ব্যবস্থাভুক্ত বিভিন্ন বাধার কারণে রাজনৈতিক পরিসরে নারীর কণ্ঠস্বর সীমিত হয়ে রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলাদেশ দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষমতার কিছু শীর্ষ পদে নারীদের অবস্থানের মতো বিষয়ও সার্বিক বাস্তবতায় তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি (মহসিন ২০১০)। তিনি মনে করেন, পারিবারিক আইনের কিছু বৈষম্যমূলক দিক গার্হস্থ্য পরিসরে সহিংসতার শিকার

নারীদের সেভাবে জনসমক্ষে আসতে দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে পারিবারিক আইনের সমালোচনা করতে গিয়ে 'ধর্ম'কে আক্রমণ করা কৌশলগতভাবে কার্যকর নয়, কারণ তাতে পারিবারিক সহিংসতার বিষয় থেকে দৃষ্টি সরে যায়। এ ছাড়া, এমন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের বেলায়ও নারীরা কীভাবে ঘরে-বাইরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন, অথবা সাধারণত কীভাবে নারীরা কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গনে বৈষম্যের শিকার হয়, এসব বিষয় সার্বিকভাবে আমলে নেওয়া হয় না। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমরূপ ও একত্ববাদী প্রবণতার বাইরে একটা বহুত্ববাদী রূপ খোঁজার দরকার আছে, যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, শ্রেণি, অঞ্চল ইত্যাদির নিরিখে বিরাজমান বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে আমলে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

উক্ত সংকলনের অন্য একটি প্রবন্ধে মাহিন সুলতান (আজিম ও সুলতান ২০১০) এই উপসংহারে পৌঁছান যে নারীর কর্মসংস্থান ও আয়ের সাথে তার ক্ষমতায়নের কোনো সরলরৈখিক সম্পর্ক নেই। বিবিধ সুযোগ বাড়ার সাথে সাথে নারীরা সেগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এবং এই প্রেক্ষিতে তারা পরিবারে ও জনপরিসরে অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব স্বর অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এসব প্রয়াস নানাভাবে বিদ্যমান রীতিনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তবে তাদের নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য নিয়ে আসছে বাড়তি কাজের বোঝা, ব্যক্তিগত সময়ের সংকোচন এবং হয়রানির বাড়তি ঝুঁকি। অবশ্য তিনি এ বিষয়েও জোর দিয়েছেন যে, এসব ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে লাভক্ষতির পাল্লা কোন দিকে ভারী হচ্ছে, সে উপসংহারও নারীদেরই টানতে হবে।

এই গবেষণাকর্মে নেতৃত্ব দেওয়া প্রধান গবেষক (নাহার ২০০৮) ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে এনজিওদের কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে 'মৌলবাদী' হিসেবে চিহ্নিত কিছু গোষ্ঠীর বিরোধিতার ওপর করা তাঁর পূর্বতন একটি কাজে দেখিয়েছেন যে, যেসব এনজিও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করছিল, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু নারীদের নিয়েই কাজ করছিল এবং লিঙ্গীয় বৈষম্যের মূল কারণগুলোর ওপর কাজ না করে অনেক ক্ষেত্রে খুবই খণ্ডিত কার্যক্রমে সীমিত ছিল। অধিকন্তু, অধিকাংশ এনজিওতেই কর্মীদের মধ্যে পুরুষদেরই আধিক্য ছিল এবং সব মিলিয়ে তারা সাংগঠনিকভাবে বা তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারে নি। অন্যদিকে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপত্তির অজুহাতে এনজিওদের ওপর যেসব আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছিল, সেগুলো আসলে ঘটছিল জাতীয় পর্যায়ে 'সেক্যুলার' বনাম 'ধর্মভিত্তিক' রাজনৈতিক পরিচয়ে বিভাজিত হতে শুরু করা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে। একই সাথে এনজিওগুলো বিভিন্ন দিক থেকে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ('মোল্লা', 'মাতব্বর' ও 'মহাজন') প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছিল, যদিও উভয়পক্ষেই সমাজের গভীরে ক্রিয়াশীল পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের উপস্থিতি ঠিকই ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের ওপর সহিংস বাধা আসার সময় এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নারীরা নিজেরা বিভিন্ন পর্যায়ে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে এক অর্থে আসলে তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের ধারক দুই পক্ষের বৃহত্তর ক্ষমতার লড়াইয়ের মাঝখানেই পড়ে গিয়েছিলেন, যেখানে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ বা সম্ভাবনা খুবই সীমিত ছিল।

সারাহ হোয়াইট (হোয়াইট ১৯৯২) তাঁর আর্গুয়িং উইথ দা ক্রোকোডাইল : জেন্ডার অ্যান্ড ক্লাস ইন বাংলাদেশ নামক সুপরিচিত গ্রন্থে নারীদের অর্থনৈতিক ভূমিকা ও গতিশীলতা এবং বাজারের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত অনেক ধ্যানধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশি নারীদের অধিকাংশ 'পর্দা'র কারণে ঘরের সীমানায় বিচ্ছিন্ন অবস্থানে রয়েছে, এমন প্রচলিত ধারণা প্রকৃত বাস্তবতাকে ঠিকমতো তুলে ধরে না। তিনি দেখান নে, যেসব নারী আসলেই ঘরের বাইরে খুব কম পা দেয়, তারাও কিন্তু পুরুষ আত্মীয়, প্রতিবেশী বা গৃহকর্মীর মাধ্যমে ঠিকই নিজেদের পণ্য বাজারজাত করে থাকে। এ ছাড়াও, তারা অন্য আরো বিভিন্ন পন্থায় গ্রামের ভেতরে ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার উল্লেখযোগ্য বিনিময় করে থাকে। কিন্তু এসব লেনদেন সচরাচর মূলধারার গবেষকদের নজরে আসত না।

আরেক গবেষণায় দেখা গেছে যে (এফরইমসন, আহমেদ ও রুমা ২০১৩), বাংলাদেশের নারীদের অনেকেই দৈনিক ষোল ঘণ্টা কাজ করে। তাদের বিশ্রামের সময় খুবই কম, ঘরের কাজের বড়ো অংশ তারাই করে, যার পাশাপাশি অনেকে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের জন্যও কাজ করে। আর কাজের ধরনের দিক থেকে শহরের চাইতে গ্রামের নারীদের ঝুড়িটা অনেক বড়ো দেখা যায়। এই গবেষণায় সাধারণভাবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই নারীদের গার্হস্থ্য কাজের গুরুত্ব আমলে নিতে দেখা গেছে। তবে সেই কাজের পূর্ণ অর্থনৈতিক মূল্য কোনো পক্ষকেই পুরোপুরি অনুধাবন করতে দেখা যায় নি।

নারীর নানামুখী কাজ যে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক এখনো যথাযথভাবে স্বীকৃত ও মূল্যায়িত হয় না, তা অপরাপর গবেষণায়ও সাধারণভাবে দেখা গেছে (যেমন নাহার ও হাসান ২০১৫; হক ২০১৩; মাহমুদ ও তাসনীম ২০১১)। এক্ষেত্রে প্রবণতাটি শুধু সামাজিকভাবেই নয়, রাষ্ট্রীয় চর্চা ও নীতিমালাতেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ (বিবিএস ২০১১) থেকে দেখা যায়, যেসব নারী শুধু গার্হস্থ্য কাজের সাথে যুক্ত তাদের কোনোভাবেই শ্রমশক্তির সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এতে করে নারীদের শ্রমের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারের হিসাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। উপরন্তু, নারীরা নিজেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখে না (মাহমুদ ও তাসনীম ২০১১)।

উন্নয়নে নারীর ভূমিকা বুঝতে গিয়ে শামিম হামিদ তাঁর হোয়াই ওমেন কাউন্ট নামক একটি গ্রন্থে (হামিদ ১৯৯৬) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হিসাব নেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার আওতায় বাজারের সাথে সম্পর্কহীন কাজের স্বীকৃতি নেই। সে সাথে উৎপাদনমুখী শ্রমের পরিবর্তনশীল ধারণার প্রসঙ্গও তিনি নিয়ে আসেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রচলিত ধ্যানধারণা ও জাতীয় পর্যায়ে হিসাব নেওয়ার ব্যবস্থার আওতায় নারীদের অনেক কর্মকাণ্ডই আমলে নেওয়া হয় না ('অ-বাজার' কাজের ৯৭ শতাংশই নারীরা করে, পক্ষান্তরে 'বাজার' কর্মকাণ্ডে তাদের ভাগ মাত্র ২৫ শতাংশ)। এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী এসব বাদ পড়া কাজ হিসাবে নিয়ে যদি বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) মাপা হতো, তা ২৯ শতাংশ বেড়ে যেত (বর্তমানে পুরুষদের উৎপাদনের ৯৮ শতাংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলেও নারীদের বেলায় এই হার মাত্র ৪৭ শতাংশ)।

রওনক জাহান (জাহান ১৯৯৫) তাঁর দা ইলিউসিভ অ্যাজেন্ডা : মেইনস্ট্রিমিং ওমেন ইন ডেভেলপমেন্ট গ্রন্থে একটি বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, সেটা হলো পৃথিবী জুড়েই জেন্ডারবিষয়ক সচেতনতা

বৃদ্ধিমূলক ও অ্যাডভোকেসির কাজ অনেক হলেও নারীদের মধ্যে দারিদ্র্যের বিস্তার ঘটছে। তিনি যুক্তি দেখান, এই প্রবণতার পেছনে একটা বড়ো কারণ ছিল এই যে, নারীদের অধিকারের প্রশ্ন মূলধারার চিন্তাচেতনা ও বৈশ্বিক ক্ষমতা কাঠামোকে বড়সড় ধাক্কা দিয়েছিল, যে প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূল প্রশ্নটিকেই অনেক ক্ষেত্রে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল এই অজুহাতে যে, 'সামাজিক বিষয়গুলো' নিয়ে আসলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন বা সরকারের করার খুব একটা কিছু ছিল না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সরকার 'নারীদের পেছনে লগ্নি'র ধারণাকে সেসব ক্ষেত্রে সহজে মেনে নিয়েছে, যেগুলোতে তারা দ্রুত অর্থনৈতিক লাভের সুযোগ দেখেছে (যেমন রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের বেলায়), বা বিভিন্ন 'উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্য বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় ভেবেছে (যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে)। কিন্তু মৌলিক বহু ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার বা ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন লক্ষ করা যায় নি।

গবেষণার ফলাফল

এই গবেষণার ফলাফল চারটি ভাগে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটিতে রয়েছে যথাক্রমে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক ভূমিকা। চতুর্থ ভাগে গবেষণা থেকে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের কথা সামনে এসেছে, সেগুলোকে দুই বর্গে তুলে ধরা হয়েছে : প্রথমত, বিএনপিএস-এর প্রকল্পসমূহে অংশ নেওয়া স্থানীয় লোকজনের দৃষ্টি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং দ্বিতীয়ত, এসব সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের পর্যায়ে পরিলক্ষিত কিছু পর্যবেক্ষণ।

নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

> 'গাছে চড়া আর চারা লাগানো ছাড়া আমরা সব কাজই করি' : নারীরা কী ধরনের কাজ করে, এই প্রশ্নের উত্তরে নেত্রকোনার কিছু নারী তথ্যদাতার মন্তব্য

প্রতিবেদনের এই অংশে নারীরা যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, সেগুলোর বিবরণের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন কাজের প্রতি সমাজে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও নজর দেব। মাঠকর্ম থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিচে যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, তাতে আমরা চেষ্টা করব নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য, গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ প্রবণতা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় তুলে ধরতে। এক্ষেত্রে প্রথমেই মোটাদাগে যে বিষয়টা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হলো, বাংলাদেশের নারীরা বর্তমানে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে, যদিও এখনো তাদের কাজের একটা বড়ো অংশই হলো গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক। যেসব নারীর মূল পরিচয় 'গৃহিণী', তাদের তো বটেই, যারা ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, তাদেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের কাজের মূল দায়িত্বটা পালন করতে হয়। তবে এই সাধারণ প্রবণতার আওতায় ঘরে ও বাইরে নারীদের যে ধরনের অর্থনৈতিক ভূমিকায় দেখা যায়, তার নির্দিষ্ট ধরন ও মাত্রা নির্ভর করে শ্রেণি, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, আবাসস্থল ইত্যাদির ওপর।

নগর বা বড়ো শহরে বসবাসরত নারীরা তুলনামূলকভাবে গৃহ-সীমানার বাইরে প্রত্যক্ষভাবে অনেক বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, ছোট শহর বা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীরা অধিকতর গৃহকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাজ করে। আবার নারীদের কাজের ধরনে গ্রাম ও শহরের বিভাজনভিত্তিক যে

ভিন্নতা রয়েছে, সেটির সুনির্দিষ্ট রূপগুলো আবার অঞ্চলভেদে আলাদা হতে দেখা গেছে; যেমন, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে স্থানীয় নারীরা খুব কমই বাইরে কাজ করে। এসব জায়গায় যেসব নারীকে আমরা বাইরের কাজে দেখতে পেয়েছি, তাদের অধিকাংশই অভিবাসিত। এ ধরনের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত অবস্থানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; যেমন, স্বামী-পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র নারীদের বাড়ির বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে 'প্রতিবন্ধকতা' কম।

নারীদের রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা, বাচ্চাদের দেখাশোনা ও স্কুলে আনা-নেওয়া, অসুস্থ ও বয়োঃবৃদ্ধদের দেখাশোনা, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির যত্ন নেওয়া, এমন বহু কাজ সামলাতে হয়। বাসার অসুস্থ সদস্যদের দেখাশোনা করা একটা বড়ো কাজ, যে প্রসঙ্গে মাঠকর্মের সময় **ঢাকার** এক নারী বলেন, 'আমরা শুধু পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের যত্ন নেই না, আত্মীয়স্বজন ও পড়শিরা অসুস্থ থাকলে তাদেরও খোঁজখবর রাখি।' বড়ো শহরগুলোতে নারীরা রান্নাঘরের কাঁচামালসহ সংসারের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাকাটার দায়িত্বও নিতে শুরু করেছে। নারীরা অনেকেই আয়মূলক কাজও করছেন, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এক্ষেত্রে আয়মূলক কর্মকাণ্ড প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে; প্রথমত, দৈনিক মজুরি বা মাসিক বেতনভিত্তিক এবং দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়সহ বিভিন্ন ধরনের অর্থকরী উদ্যোগ। মজুরিনির্ভর কাজের মধ্যে নারীদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি দেখা যায় পোশাকশিল্পে আর গৃহকর্মীর ভূমিকায়। নিম্নবিত্ত শ্রেণির অনেক নারী দিনমজুর হিসেবে ইট ভাঙা, মাটি কাটা ও অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমনির্ভর কাজ করে। আয় কাঠামোর একটু উপরের দিকে নারীদের একটা ক্ষুদ্রতর অংশ বিক্রয়কর্মী হিসেবেও বিভিন্ন বিপণীবিতানে কাজ করে। নারীদের জন্য এ ধরনের তুলনামূলকভাবে নতুন খাত ছাড়া আগে থেকে নারীদের দেখা যেত, এমন বিভিন্ন পেশা তো রয়েছেই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একই কাজ করলেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের পারিশ্রমিক কম। কিছু ক্ষেত্রে এই বৈষম্য এতটাই প্রকট যে, দেখা গেছে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক মজুরিতেই কাজ করছে।

আমাদের গবেষণাকালে গৃহীপনার পাশাপাশি অন্য যেসব ভূমিকায় নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা গেছে, মোটাদাগে সেগুলো হলো দর্জি, গৃহশ্রমিক, পোশাকশিল্প শ্রমিক, রাস্তার বিক্রেতা, স্কুল ও অফিসের কর্মচারী, দোকানের বিক্রয়কর্মী, এনজিওর স্কুলশিক্ষক, নির্মাণশ্রমিক, বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ফেরিওয়ালা (যেমন কাপড়, মাছ, সবজি, বাদাম ইত্যাদির), পিঠা বিক্রেতা, ছোট খাবারের দোকানদার, কৃষিশ্রমিক ইত্যাদি। গবেষণা এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ছোটখাটো ব্যবসায় যুক্ত হবার বিষয়টি লক্ষণীয়; কিন্তু একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো বাজারের সাথে তাদের কার্যকর যোগাযোগের অভাব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রি করবার সীমিত সুযোগ ঘটেছে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উদ্যোগে; কিন্তু বেশিরভাগ উদ্যোক্তা জানিয়েছেন যে, এতে মুনাফার পরিমাণ এতটাই কম যে তারা অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন খাতের মধ্যে কৃষির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সবসময়ই ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে এর ধরন যেমন পালটেছে, তেমনি সার্বিক মাত্রাও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি হিসাব অনুসারে, কর্মসংস্থান আছে এমন নারীদের মধ্যে ৪৪.৫ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে কৃষি, মৎস ও বন সম্পদ খাতে। পুরুষদের বেলায় এই হার হলো ৩৩.৪ শতাংশ (বিবিএস ২০১৬)। কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে

যেসব অনুমিত হিসাব দেখা যায়, তা শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগের মধ্যে রয়েছে (বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৩)।

অক্টোবর ২০১৬-এ বিএনপিএস ও নারী মৈত্রী আয়োজিত এক সম্মেলনে বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্তমানে নারীর অবদান ৫৩ শতাংশ, যদিও এরপরও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী কৃষকদের কোনো স্বীকৃতি নেই; যেমন, রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে ১ কোটি ৩৯ লাখ কৃষক কার্ড বিতরণ করা হলেও নারী কৃষকদের ভাগ্যে তা জোটে নি (প্রথম আলো ২০১৬)। সেখানে এই তথ্যও তুলে ধরা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে এখন কৃষি উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে নারী শ্রমশক্তির ৬৮ শতাংশই জড়িত, কিন্তু তারপরেও পুরুষ কৃষিশ্রমিকের তুলনায় নারীরা ৪১ শতাংশ কম মজুরি পায়। ভূমিতেও যেমন নারীর সমঅধিকার নেই, তেমনি বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়।

কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রায় যে সাম্প্রতিক পরিবর্তন ঘটছে, তার একটি প্রধান ক্ষেত্র হলো মজুরি শ্রমিক হিসেবে তাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। অন্যদিকে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারসমূহে নারীরা নিজেরা সরাসরিভাবেও মাঠে বেশি শ্রম দিচ্ছে পুরুষ সদস্যদের অভিবাসী শ্রমিক হওয়ার কারণে বা স্রেফ সংসারের ব্যয়ভার লাঘব করতে। তথাপি শ্রমের অনুপাতে ফসলের ওপর নারীর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই; যেমন, নেত্রকোনায় একটি আলোচনায় বিএনপিএস-এর একজন স্থানীয় পুরুষ সদস্য বলেছেন যে, 'নারী উৎপাদন করে অথচ এক কেজি চালও যদি সে বাবার বাড়ির সদস্যদের দেয়, তাহলে তাকে গালমন্দ শুনতে হয়'। আবার এটাও সুবিদিত যে, নারী-পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি-বৈষম্যও বিদ্যমান। এসবের প্রেক্ষিতে কৃষি বা অন্যান্য খাতে নারীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতায়নের পরিবর্তে বাড়তি 'বোঝা' বা শোষণ-বৈষম্যই নির্দেশ করে।

অবশ্য আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, ঘরের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাজে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে বেশ তারতম্য লক্ষ করা যায়। সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম নগরীতে দেখা গেছে, স্থানীয় নারীরা, যারা এসব জায়গায় বহু প্রজন্ম ধরে বসবাসরত পরিবারের সদস্য, খুব কম ক্ষেত্রেই তারা বাড়ির বাইরে কাজ করে। চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় নিম্ন আয়ের নারীদের জন্য আয়ের একমাত্র রাস্তা হলো নিকটবর্তী একটা কারখানার জন্য ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা বানানো। তাদের অনেকে সেলাইয়ের কাজ জানেন, কিন্তু এই দক্ষতা তাদের কোনো ধরনের আয়মূলক কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। চট্টগ্রামে সাধারণভাবে দেখা গেছে, যেসব নারী ঘরের বাইরে কাজ করেন, তাদের অধিকাংশই অভিবাসিত হয়ে সম্প্রতি এই নগরীতে এসেছেন। নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করার বিষয়টি খুব অসম্মানজনক হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে সন্দ্বীপে। চট্টগ্রামেও এমন দৃষ্টিভঙ্গি বিরল নয়; যেমন, বাকলিয়াতে একজন নারী মন্তব্য করেন, 'আমি মরে গেলেও বাসার বাইরে কাজ করব না'। অন্যান্য এলাকায়ও দেখা গেছে, ঘরের বাইরে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে খুব ভালো চোখে দেখা হয় না, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে নারীর গণ্ডি বেঁধে দেওয়ার কাজ করে সম্মান ও মর্যাদার মতো ধারণা। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে যেসব খাত প্রথাগতভাবে পুরুষদেরই একচেটিয়া দখলে ছিল, সেসবে নারীদের জায়গা ছেড়ে দিতেও ব্যাপক অনীহা দেখা গেছে পুরুষদের মধ্যে (ডাননিকার ২০০২)। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয়কে মানতে না চাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে বিশেষ অস্বস্তি দেখা যায়। এসব বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে

তাদের অনেকে বলেন যে, পুরুষের দায়িত্ব হলো তাদের স্ত্রী ও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া। তাদের অনেকের দৃষ্টিতে বাইরে কাজ করতে যাওয়া স্ত্রীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা একজন পুরুষের জন্য মোটেও কাম্য নয়। তাঁরা মনে করেন, এটা মেনে নেওয়া হলে তাতে নারীদের ওপর তাদের ক্ষমতা থাকবে না এবং পরিবারে বিবাদ বাড়বে। এ ব্যাপারে নারীদের অনেকে বলেছেন, তাদের স্বামীদের ভয় থাকে যে স্ত্রীরা ঘরের বাইরে কাজ করলে বেশি খরচ করার অভ্যাসও অর্জন করবে, যার ফলে সংসারের জন্য বরাদ্দ অর্থে টান পড়তে পারে। তবে এসব সত্ত্বেও ঘরের বাইরে কাজ করা নারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং জনপরিসরে তাদের উপস্থিতি ও চলাচলের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও কমে আসছে।

যেসব ক্ষেত্রে নারীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগে নামে, পুঁজি মূলত তাদের নিজেদের সঞ্চয় ও ঋণ থেকেই আসে। আত্মীয়স্বজনদের কাছে ধার নেওয়া ছাড়া তাঁরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা সমবায় সমিতি থেকে ঋণও নেন, যেগুলোতে সুদের হার একটু চড়াই থাকে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালানো অনেক সংস্থা আছে, যারা মূলত নারীদেরই ঋণ দেয়। ফলে অনেক সময় পরিবারে পুরুষ সদস্যদের প্রয়োজনেই নারীরা ঋণ নেন। অন্যদিকে এটা জানা গেছে, যেসব নারী বিবাহিত নন বা স্বামীর সাথে থাকেন না, তাদের জন্য ঋণ পাওয়া নাকি দুঃসাধ্য। এর কারণ হতে পারে এই যে, ঋণ কার্যক্রম চালানো এনজিওসমূহ হয়ত মনে করে, যেসব নারীর স্বামী রয়েছে, তাদের বেলায় ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নারীরা যে আয় করে, তার সিংহভাগ ব্যয় হয় পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য। এক্ষেত্রে অনেকের বেলায় খরচের একটা প্রধান খাত হলো সন্তানদের শিক্ষা। নারীদের প্রত্যাশা থাকে, সন্তানদের শিক্ষার পেছনে লগ্নি করলে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এবং তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরোনোর রাস্তা খুঁজে পাবেন। নিজের আয় থেকে নারীরা অবশ্য মাঝে মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত পোশাক, অলঙ্কার, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদিও কেনেন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী।

কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে নারীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। এটি হয়ত খুব একটা মামুলি বিষয়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারীদের জন্য নিজস্ব একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা তাদের পরিচিতিতে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করে। এতে তারা ক্ষমতায়িত বোধ করে। একভাবে একই কথা বলা যায় ঋণ নেওয়ার জন্য এনজিওর খাতায় নাম লিখিয়ে তাদের সমর্থিত কোনো সমিতির সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও। আর নিজস্ব একটা ব্যাংক হিসাব থাকার অর্থ হলো, নারীরা চাইলে তাদের আয় গোপনীয়তার সাথে গচ্ছিত রাখতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। নিজেদের আয় গোপনে গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে নারীদের অনেকে বিদ্যমান লিঙ্গীয় মতাদর্শেরও সহায়তা নেয়। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব যে স্বামীদের, সে কথা তখন তারাও বলে।

নারীদের কাজ ও গণ্ডি বিষয়ক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সেগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এলেও এসব বিষয়ে প্রচলিত মতাদর্শ, সামাজিক নিয়মকানুন ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য কোনো মৌলিক পরিবর্তন এই গবেষণার মাঠকর্মের সময় দেখা যায় নি; যেমন, আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, নারীরা ঘরের বাইরে যতই কাজ করুক না কেন, ঘরের কাজেও তাদের ঠিকই আগের মতোই সময় দিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে অল্প পরিসরে

হলেও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে বলে আমাদের তথ্যদাতাদের কেউ কেউ জানিয়েছেন; যেমন, পোশাকশিল্প শ্রমিকদের কারো কারো স্বামী নাকি কখনো সখনো রান্নাবান্নার কাজও করে থাকে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব 'ঘরের কাজ'কে এখনো 'মেয়েদের কাজ' হিসেবেই দেখা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তারা নারীর কাজে সহায়তা করছে মাত্র!

অবশ্য নারীর ভূমিকা, গণ্ডি ও গতিশীলতা নিয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও সামাজিক নিয়মকানুনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও তথ্যদাতাদের অনেকে, বিশেষ করে নারীরা বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন, ঘরের বাইরের কাজ ও আয় করা, চলাচল) তাদের 'স্বাধীনতা' বা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। এমন পরিবর্তনকে তারা ইতিবাচকই মনে করে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, অনেক নারীর 'সামাজিক পুঁজি' এবং 'দরকষাকষির ক্ষমতা' ধীরগতিতে হলেও বেড়ে চলেছে। তবে এ ধরনের ক্ষমতায়নের মানে আবার এই নয় যে, নারীরা 'ভালো মেয়ে/মন্দ মেয়ে'র সামাজিক নির্মাণকে অস্বীকার করতে পারে বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মেনে নিয়েই তারা নিজেদের পরিধি বাড়ায়।

মাঠপর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন পুরুষ দলের যেসব সদস্যের সাথে কথা বলা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই বলেছেন যে রান্না করা, সন্তান পরিচর্যা, ধোয়ামোছা ইত্যাদিসহ (যেগুলোর বেশ কিছুর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) উত্তোলিত ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ থেকে শুরু করে হস্তশিল্প, এমনকি পরিবারের সবার জন্য মোনাজাত বা প্রার্থনা করা, এগুলোর সবই হলো 'মেয়েদের কাজ'। তারা এও বলেন যে, নারীরা খোলা জায়গায় চারা লাগানো, নদীতে মাছ ধরা বা রাস্তার পাশের ক্ষেত থেকে ফসল তোলার কাজ করতে পারে না। কারণ তাহলে অপরিচিত লোকজন তাদের দেখবে, এবং এতে সমাজে তাদের সম্মান কমে যাবে।

সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, নারীরা বাড়ির চৌহদ্দি বা কাছাকাছি পরিধির মধ্যেই কাজ করবে অচেনা লোকদের নজর এড়িয়ে। তারা ঠিক কী ধরনের কাজ করবে, তা অবশ্য পরিস্থিতি ও স্থানকালপাত্র ভেদে ভিন্নরকম হতে পারে। এমনকি সামাজিকভাবে 'মেয়েদের কাজ' নামে যে গণ্ডি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা যাই হোক না কেন, বাস্তবে নারীরা অনেক কাজই করে। তারা নিজেরা তাই মনে করে এবং এক্ষেত্রে মাঠকর্ম চলাকালে নেত্রকোনার নারীদের দেওয়া এই বক্তব্য নিজেদের কাজের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে যে, 'গাছে চড়া আর চারা লাগানো ছাড়া আমরা সব কাজই করি। এমনও সময় আছে আমরা ফসল তোলার কাজও করি।' নারীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পুরুষদের বলতে শোনা গেছে, 'মেয়েরা আর কীইবা কাজ করে! তারা খালি ঘরে বসে অলস সময় কাটায়।'

মাঠকর্মের এক পর্যায়ে যুবক দলের সদস্যরা বলেন যে, নারীরা কাঠমিস্ত্রি, মেকানিক বা গাড়িচালকের মতো কাজ করে না। তারা এটাও জানায় যে, এসব কাজ নারীরা শিখে নিতে পারে না তা নয়, তবে তারা তা করতে পারে না সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। অন্যদিকে, চট্টগ্রামের একটি যুবক দলের সদস্যরা যেমনটা জানায়, ঘরের যেসব কাজ সচরাচর নারীরা করে থাকে, সেগুলো চাইলে পুরুষরাও শিখে নিতে পারে, কিন্তু এসব 'মেয়েদের কাজ' তারা করে না। কারণ কেউ যদি তা করে, তাহলে সে বন্ধুমহলে উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে।

নারীদের কাজ প্রসঙ্গে সন্দ্বীপে আলোচনায় অংশ নেওয়া একটি পুরুষ দলের সদস্যরা জানান, 'নারীরা ব্যবসা করতে পারে না কারণ তাদের জ্ঞান কম।' ঢাকায় বস্তিবাসী কিছু পুরুষ অভিমত দেন, 'মেয়েদের রিকশা চালানো বা মাটি কাটার মতো কাজ করা ঠিক নয়। এগুলো ছেলেদের কাজ। আর স্বামী যদি যথেষ্ট আয় করে, তাহলে স্ত্রীর কাজ করার দরকার নাই।' বিভিন্ন জায়গায় অনেকে, পুরুষরা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও এমন মত দেন যে নারীদের বাজারে যাওয়া বা ঘরের বাইরে কাজ করা ঠিক নয়। কারণ তাতে তারা পরপুরুষদের সংস্পর্শে আসবেন, যা কাম্য নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু নারীর ভিন্ন অভিজ্ঞতা বা মতামত আছে এবং তারা জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সব কাজ করতে পারি। করি। আর কাজের প্রয়োজনে যেখানে যাওয়ার দরকার, যাই।'

সাধারণভাবে এটা আশা করা হয় না যে নারীরা ঘরের বাইরে একা চলাফেরা করবে। কেউ তা করলে সমাজ সচরাচর তা ভালো চোখে দেখে না। এ ব্যাপারে সন্দ্বীপের একজন নারী বলেন, 'আমি বাড়ির বাইরে গেলে লোকে নিন্দা করে। আমি খারাপ, এ কথা আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে। নারী ও পুরুষ সবাই এমন কথা বলে। আমি কী কাজে বাইরে গেলাম, তা তারা জানে না এবং জানতেও চায় না। কিন্তু না জেনেই তারা এসব বলে।' স্বামী প্রবাসে রয়েছেন, এমন এক নারী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানান যে, দু'একদিন যখন তাঁকে বাজারে যেতে হয়েছিল প্রয়োজনে, প্রতিবেশীরা তাঁকে জেরা করতে শুরু করে সে কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল বলে। অবশ্য সন্দ্বীপেরই এক নারী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জানান যে, আজকাল ৭০ শতাংশ স্বামীই তাদের স্ত্রীদের বাইরে যেতে বাধা দেন না। সাধারণভাবে নারী-পুরুষ সবাই মনে করেন, নারীদের বেলায় কাজ করা ও কেনাকাটার জন্য বাইরে যাওয়ার হার আগের থেকে বেশ বেড়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, নারীদের কাজ ও ভূমিকা কী, তাদের গণ্ডি কী হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে প্রচলিত অনেক ধ্যানধারণা এখনো সমাজে বদ্ধমূল রয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আলামত বা ইঙ্গিতও মেলে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নারী-পুরুষদের মধ্যে সচেতনতাও বাড়ছে, সেগুলো নিয়ে তাঁরা ভাবছেন, আলাপ বিতর্ক করছেন। তথাপি সবার চিন্তাচেতনায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পরিবর্তন আনতে গেলে আরো সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে।

ঘরের কাজে পুরুষদের অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা

আগেই একটা উদাহরণের মাধ্যমে একটা সম্ভাব্য নতুন প্রবণতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষীণমাত্রার হলেও কিছুটা ইতিবাচক। সেটা এই যে, সংখ্যায় কম হলেও কিছু পুরুষ এখন ঘরের কাজে অংশ নিচ্ছেন, নারীদের সাহায্য করছেন। সচরাচর নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘরের যে ধরনের কাজে পুরুষদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তোলিত ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, পানি আনা, বাচ্চাদের যত্ন নেওয়া, হাঁসমুরগি ও গবাদিপশুকে খাবার দেওয়া, লাকড়ি জোগাড় করা, মাছ কাটা ইত্যাদি। তথ্যদাতাদের মতামত থেকে এমন ধারণা মেলে যে, পুরুষরা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ঘরের কাজে সাহায্য করেন। নারী-পুরুষ উভয়েই এমন তথ্য দিয়েছেন। তবে পুরুষ তথ্যদাতাদের অনুমিত হার একটু বেশি। তারপরও পুরুষদের আচরণে যে পরিবর্তন আসছে, এটা নারীরাও জানিয়েছেন। সন্দ্বীপের একজন নারী তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেন, 'আগে সে নিজের খাওয়ার জন্যও গ্লাসে পানি ঢালত না, কিন্তু এখন সেটাসহ টুকটাক ঘরের কাজে সাহায্য করে'। আরেকজন নারী যোগ করেন, 'আগে কেউই মাথা ঘামাত না মেয়েরা কাজ করতে করতে মারা যাচ্ছে কি না!'।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব পুরুষ ঘরের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, তারাও তাদের সহায়ক ভূমিকাকে সাময়িক (যেমন স্ত্রীর অসুস্থতা বা গর্ভবতী থাকার সময়ের জন্য) বা পরিস্থিতিনির্ভর হিসেবেই দেখে। আর অধিকাংশ পুরুষ যারা ঘরের কাজ করে, সেটা তাদের মর্জিমাফিক করে, দীর্ঘসময়ের জন্য বা প্রতিদিন করে না। সন্দ্বীপের কিছু পুরুষের মন্তব্য শুনে বোঝা যায়, তাঁরা সবাই মনে করেন, বাড়ির বাইরে গিয়ে আয় করা পুরুষদেরই কাজ এবং নারীদের কাজ হচ্ছে ঘরের দিকটা সামলানো। তবে গ্রামাঞ্চলে খুবই বদ্ধমূল এমন ধারণা শহরে অভিবাসিত নিম্ন আয়ের মানুষদের বাস্তবতার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই আর মেলে না। এই প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিলেও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। নারীদের কাজ হিসেবে বিবেচিত কোনো কিছু করতে হলে সেটাকে অনেক পুরুষ এখনো অবমাননাকর মনে করেন; যেমন, চট্টগ্রামের একজন নারী তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেন, 'আমি অসুস্থ হলে সে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, কিন্তু কখনো রান্না করে না। সে বলে, দরকার হলে সে হোটেল থেকে খাবার কিনে আনবে, কিন্তু রান্না করতে পারবে না'। এমন পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে অন্য নারীরাও বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন; যেমন, 'আমরা দরকারে স্বামীদের কাজে সাহায্য করি, কিন্তু আমাদের বেলায় তারা তা করে না। তারা নিজেদের লুঙ্গিটাও ধোয় না'। নেত্রকোনার বারহাট্টায় যখন কিছু নারী জানান যে, তাদের স্বামীরা তাদের ঘরের কাজে সাহায্য করে। তখন অন্যরা এই বলে প্রকাশ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, 'আমাদের স্বামীরা কি আমাদের কাজ করবে?'।

বিবাহিত পুরুষদের মতোই কিশোর বা তরুণরাও সচরাচর ঘরের বিভিন্ন কাজ করে না, বিশেষ করে যদি তাদের কর্মক্ষম বোন থাকে। অবশ্য বাজার করার কাজ তারা করতে পারে। অনেকে মাঠে তাদের বাবাদের কৃষিকাজেও সহায়তা করে। তবে ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে, যেমন, কোনো বোন না থাকলে, উঠতি বয়সের ছেলেদের কথিত 'মেয়েদের কাজ' করতে দেখা যায়।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিসরে নারীদের অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতির পরিমাণগত দিকের প্রতি যেমন নজর দেব, তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের গুণগত দিকও আমরা বিবেচনা করব। এর পাশাপাশি মাঠপর্যায় থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য, মতামত ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়, যেমন নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নিয়ে যে ধরনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, সেগুলোসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা, ইত্যাদিও তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নারীর ক্ষমতায়নে বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ২০১৪ সালে জেন্ডার গ্যাপ বা লিঙ্গীয় ফারাক ঘোচানোর ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির যে তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করেছিল, তাতে দেখা যায়, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিচারে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত মোট ১৪২টি দেশের মধ্যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অষ্টম! কিছুটা অপ্রত্যাশিত এই অবস্থানের পেছনে অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সূচকের বিশেষ অবদান রয়েছে। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এটা উল্লেখ্য যে, লিঙ্গীয় সমতা অর্জনের পথে অগ্রগতির তুলনায় আরো যে তিনটি ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়েছে—

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষাগত অর্জন এবং স্বাস্থ্য— সেগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১২৭, ১১১ ও ১২২। চারটি ক্ষেত্রের সম্মিলিত অর্জন মেলালে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের স্থান ১৪২টি দেশের মধ্যে ৬৮ (ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ২০১৪:৮-৯)। প্রতিবেদনে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, একই ধরনের যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২০০৬ সালে করা হয়েছিল, তখনকার তুলনায় আলাদাভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবেও বাংলাদেশের অবস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। কাজেই সব মিলিয়ে অর্জিত অগ্রগতি নিয়ে এদেশের মানুষ গর্ব করতেই পারে।

বাকি তিনটা ক্ষেত্রের তুলনায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান যে অন্য বহু দেশের চেয়ে উচ্চ অবস্থানে রয়েছে, তার মূল কারণ হলো শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সূচক হচ্ছে সরকারপ্রধান পদে নারীদের বহাল থাকার মেয়াদ, যেখানে বাংলাদেশ অধিকাংশ দেশের ওপরে রয়েছে। মূলত এই কারণেই অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের তুলনায় রাজনীতিতে বাংলাদেশের নারীদের অনেকে বেশি লিঙ্গীয় সমতা ভোগ করছে, এমন একটা সাংখ্যিক ফল ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের প্রতিবেদনে চলে এসেছে, যা বাস্তবতার অন্যান্য কিছু দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, বাংলাদেশে নানা পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় তাদের জায়গা এখনো অনেক কম। এ সংক্রান্ত কিছু হিসাব উদাহরণ হিসেবে নিচের অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন স্তরে নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বাস্তব চিত্র

জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সালে নারী সাংসদ ছিলেন ১০ শতাংশ, যা ২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশে। কিন্তু একদিকে যেমন এই হার এখনো বেশ স্বল্প, অন্যদিকে সংসদীয় কমিটি, মন্ত্রণালয় ইত্যাদিতে নারীদের উপস্থিতি আরো নগণ্য। উল্লেখ্য, গত আড়াই দশক ধরে বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল ও সরকারপ্রধান হিসেবে দুজন নারী ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরাসরিভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদের সংখ্যা মাত্র ১৯ জন এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট নারী সাংসদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯, যার অর্থ হলো এখনো মোট সাংসদের মাত্র ১৯.৭ শতাংশ নারী (আহমেদ ২০১৬)। একই ধরনের চিত্র স্থানীয় সরকারের নানা ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এক্ষেত্রে নারীরা কেবল সংখ্যায়ই কম নন বরং তাঁরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতারও মুখোখুখি হন। তাদের অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচিত পুরুষ সাংসদদের মুখাপেক্ষী হতে হয় এবং স্থানীয় প্রশাসনও তাদের গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে না। ফলে উন্নয়নমূলক কাজ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নারী সাংসদের মোট সংখ্যা যেমন কম, তেমনি যারা আছেন তাদেরও বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি ও মন্ত্রীসভায় যথাযথ অন্তর্ভুক্তি বা কার্যকর অংশগ্রহণ এখনো খুবই অসম পর্যায়ে রয়েছে (ফাইরয় ২০০৩)।

স্থানীয় সরকারগুলোতেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব এখনো অসম ও সীমিত রয়ে গেছে। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী নারীদের হারও কমে গিয়েছে; যেমন, ২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনে ৪৮০ উপজেলার সংরক্ষিত নারী ভাইস চেয়ারপারসন আসনের জন্য মোট ২৯০০ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু একই স্তরের ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৪৫৮ উপজেলায় সংরক্ষিত নারী ভাইস চেয়ারপারসন আসনের প্রার্থী ছিলেন মাত্র ১৫০৭ জন, যা আগের প্রায় অর্ধেক (আহমেদ ২০১৬)।

অন্যদিকে উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত আসনগুলোর জন্য নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের হার অতি নগণ্য। একই চিত্র ইউনিয়ন পরিষদসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নারী জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি

এ গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৫ জন নারী জনপ্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যাদের মধ্যে ছিলেন সিটি করপোরেশনের ২ জন, পৌরসভা পর্যায়ের ১ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের ২ জন সদস্য। কথোপকথনে আমরা দেখেছি যে স্থানীয় সরকারে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ঢাকার একজন নারী কাউন্সিলর জানান যে, বিভিন্ন সভায় নারীদের কথার গুরুত্ব দেওয়া হয় না কিংবা তাদের বলতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া, তাঁরা উন্নয়নের বরাদ্দও ঠিকমতো পান না। আবার চট্টগ্রামের একজন নারী কাউন্সিলর বলেন যে, তাঁর যে কাজের সুযোগ রয়েছে এবং মেয়রসহ অন্য কাউন্সিলররা যে সহযোগিতা করেন, তা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরাও অনেকটা একই ধরনের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জানান যে তাঁরা সভায় কথা বলতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঢাকার একজন নারী জনপ্রতিনিধি বাদে বাকি কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নন বলে জানান। তাদের মধ্যে সাধারণভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কৃতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে দেখা গেছে, যা তাদের দলীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করে।

সাধারণভাবে মাঠকর্মে আমরা যে ধরনের মতামত জানতে পেরেছি, তাতে আমেনা মহসিনের একটি কাজে উল্লিখিত কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণের প্রতিফলনই আমরা দেখেছি। তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যেমন, তেমনি জাতীয়ভাবেও সরকারে ও রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের সার্বিক হার খুব কম (মহসিন ২০১০:৩২)। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হচ্ছে, নারীদের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন স্তরে আসন সংরক্ষণের নীতি সেভাবে ফলপ্রসূ হয় নি এবং পুরো ব্যবস্থাটিরই একটা পুনর্মূল্যায়ন দরকার। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলে দীর্ঘদিন নারী নেতৃত্ব থাকলেও সেগুলো সম্ভব হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কভিত্তিক উত্তরাধিকার সূত্রে। একইভাবে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের বাইরে যদি নারীদের সাধারণ আসনে প্রার্থী হিসেবে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তা হয় স্বামী বা পিতার মৃত্যুজনিত শূন্য পদের উপনির্বাচনে। এর বাইরে নারী জনপ্রতিনিধিরা মূলত সংরক্ষিত আসনেই নির্বাচিত হয়ে আসেন। এই বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়, রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা কোনো গুণগত বা কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিচায়ক নয় (হোয়াইট ১৯৯২:১৫)। এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য যেসব পূর্বশর্ত পূরণ হওয়া দরকার, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চায় পরিবর্তন আনা, যাতে করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বেড়ে যায় (আহমেদ ২০১৬)।

আমাদের মাঠকর্মের সময় স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোনো তথ্য প্রমাণ পাই নি। এক্ষেত্রে যেসব নারীর সাথে আমরা কথা বলেছি, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে তাদের কারোরই কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ব্যতিক্রম হিসেবে ছিলেন একটি সিটি করপোরেশনের একজন নারী কাউন্সিলর এবং নেত্রকোনার একটি প্রকল্পসংশ্লিষ্ট দলের একজন

সদস্য, যিনি ক্ষমতাসীন দলের নারী শাখার একটি স্থানীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে গিয়েছিল যখন অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে হাতাহাতি ও মারামারি শুরু হয়ে যায়।

মাঠকর্মে যেসব নারীর সাথে আমরা কথা বলেছি, তাদের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও খুব কমজনেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। অল্পসংখ্যক যাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেগুলো মূলত ছিল সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের বেলায় এবং সচরাচর প্রার্থীরা যদি স্থানীয় পর্যায়ের বা পরিচিত কেউ হয়ে থাকেন। তথ্যদাতাদের অধিকাংশই বলেন যে তাঁরা পূর্বপরিচিত প্রার্থীদের পছন্দ করেন। কারণ এমন কেউ নির্বাচিত হলে তাদের কাছে যাওয়া সহজ। স্থানীয় নারীরা অনেকে অর্থের বিনিময়েও নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে কোনো মিছিল সমাবেশে অংশ নেওয়ার বদলে তাদের কাজ ছিল বাসায় বাসায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জন্য ভোট চাওয়া। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেসব সাধারণ নারীর সাথে কথা বলেছি, তাদের কেউই নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। অনাগ্রহের মূল কারণ হিসেবে সবাই অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করেন। তবে আলোচনায় এটাও বেরিয়ে আসে যে, নির্বাচন করতে গেলে টাকাপয়সা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি, পেশিশক্তি, পারিবারিক মর্যাদা, রাজনৈতিক দলের সমর্থন, প্রভাবশালী ও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতা, এমন বহু বিষয় লাগে। অন্যদিকে এটাও অনেকে জানিয়েছেন যে, একজন পুরুষ প্রার্থী যে ধরনের সমর্থন পান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে, সে তুলনায় নারীরা এখনো যথেষ্ট উপেক্ষিত রয়েছেন, তা তাঁরা সরাসরি কিংবা সংরক্ষিত আসন যেখান থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসুন না কেন।

স্থানীয় পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধি বলতে এখনো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রায় অবধারিতভাবেই সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত হওয়া প্রার্থীই বোঝেন। এ প্রসঙ্গে সন্দ্বীপের একজন পুরুষ তথ্যদাতার অভিমত উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেন, 'যদি নারীরা সংরক্ষিত আসনে প্রতিযোগিতা করে, তাহলে কারো কোনো আপত্তি থাকে না, বরং অনেকেই গর্ব বোধ করে। কিন্তু যদি কোনো নারী উন্মুক্ত কোনো পদে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তাকে সমালোচনা করা হয় এবং অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়'। এ ধরনের বৈরী পরিবেশ কম-বেশি অন্য এলাকাগুলোতেও রয়েছে, যদিও তা হয়ত সব ক্ষেত্রে সন্দ্বীপের মতো প্রকট নয়।

বিচার-সালিশে নারীদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে সামাজিক পরিসরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির কাজ ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষরাই করে এসেছেন। এসব ক্ষেত্রে অতীতে নারীদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা বা অংশগ্রহণ ছিল না। তবে বিএনপিএস-এর মতো যেসব সংগঠন নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে, তাদের অনেকের প্রচেষ্টায় তৃণমূল পর্যায়ে বিবাদ নিষ্পত্তি বা সালিশ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই পরিসর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অবশ্য সালিশে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দল ও উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে দু'এক জায়গায়, যেমন নেত্রকোনায়, নারীরা সমাজের পুরুষ নেতৃবৃন্দের সাথে একত্রে বিবাদ মীমাংসা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বলে জানা গেছে। তবে সাধারণভাবে সালিশির মতো প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের ঘটনা এখনো ক্ষুদ্র পরিসরেই সীমিত রয়েছে এবং নিজেদের এলাকার বাইরে বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে

পুরুষদের পাশাপাশি বসে নারীরাও বিরোধ নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য এখনো বিরল।

সামাজিক পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ

সামাজিক ভূমিকা কোনোভাবেই বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি সবার জানা যে পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা রয়েছে। নারীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রায়ই, বিশেষত অর্থব্যয়, সন্তানদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বামীর মতামত জরুরি, যেসব ক্ষেত্রে পুরুষের বেলায় জবাবদিহিতা কম। সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা ও অধিকারের বিষয়েও তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি এ যাবৎ, যা এখনো তীব্রভাবে পুরুষ মতাদর্শ ও নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। অবশ্য নারীদের শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে, যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণে এখনো নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। বিশেষভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, নারীর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা, নারীবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি এখনো বড়ো বাধা হয়ে আছে। এসবের ফলে সার্বিকভাবে এখনো মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে অনেক জায়গাতেই। এসব বিষয় নির্বাচিত কিছু শিরোনামের আওতায় মাঠকর্মলব্ধ তথ্যসহ নিচে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা

নারীদের বৈবাহিক মর্যাদা যাই হোক, অনেক বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাদের পুরুষদের মতামত বা অনুমতি নিতে হয়। বিয়ের আগে এই ভূমিকায় সচরাচর থাকে বাবা, যে জায়গাটা বিয়ের পর স্বামী নিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিয়েতে তাদের মতামত নেওয়া হয় না বা নেওয়া হলেও সেটাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আজকাল মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে যদি তাদের পছন্দের কোনো ছেলে থাকে, তারা বাবা-মাকে বুঝিয়ে সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে থাকে। এ ব্যাপারে মাঠকর্মের সময় এক তথ্যদাতা মন্তব্য করেন, 'আজকাল মেয়েদের লজ্জা কম, তারা তাদের মতামত জানাতে ভয় পায় না।' এমন পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে মা-বাবারাও অনেকে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে নমনীয়তা দেখাচ্ছেন। এর একটা কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মেয়েকে যদি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হয়, সে ছোটখাটো ব্যাপারেও স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বাবা-মার কাছে নালিশ করে যেতে পারে। অন্যদিকে মেয়ের পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়েতে সম্মতি না দিলে তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারে। তা ছাড়া, আজকাল ছেলেমেয়েরা নানাভাবে যোগাযোগ রাখতে পারে, দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে। এমন বিভিন্ন কারণে অভিভাবকরা আগের মতো কঠোরতা দেখায় না সব ব্যাপারে।

তথ্যদাতাদের মতে, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যদি নিজের পছন্দের কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, তার মা-বাবা সম্ভাব্য পাত্রের 'সুযোগ্যতা' সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর তাদের সম্মতি বা আপত্তি যে কোনোটা জানাতে পারেন। অভিভাবকদের সম্মতি না পেলে মেয়ে পালিয়েও বিয়ে করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মা-বাবা শুরুতে বিয়েটা না মানলেও পরে মেনে নেন, বিশেষত যদি তাদের নাতি নাতনি হয়। মাঠকর্মের সময় অধিকাংশ তথ্যদাতা জানিয়েছেন, সাধারণত কেউ বিবাহ বিচ্ছেদ দেখতে চান না। যদি চরম কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যেখানে ব্যাপক নির্যাতন বা গভীর অসন্তোষ কাজ করে, তাহলে অবশ্য

ভিন্ন কথা। এ ধরনের ক্ষেত্রেও সচরাচর মেয়েরা যতটা সম্ভব সহ্য করে যাওয়ার চেষ্টা করে শুরুতে, কিন্তু যদি তারা নিজেরা সামলাতে না পারে, মা-বাবাকে খবর দেয়, যাতে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি বা প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়।

দুই পরিবারের মধ্যে আলাপের মাধ্যমে কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান না এলে সচরাচর স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে সবাই যায় এবং তাতেও কাজ না হলে আদালতের দ্বারস্থ হয়। সবার চেষ্টা থাকে পারিবারিকভাবেই এসব বিষয়ের মীমাংসা হোক। একজন তথ্যদাতা বিষয়টাকে এভাবে বর্ণনা করেন, 'আমরা প্রথমে একবার দেখব, এরপর আবার দেখব, কিন্তু তিনবারের মাথায়ও যদি দেখা যায় সমাধান হচ্ছে না, তখন মেয়ের ইচ্ছা মেনে নেব'। চট্টগ্রামের একটি দলীয় আলোচনায় তথ্যদাতারা বলেন, মেয়েদের তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিলে যদি বিয়ের পর তারা সুখী না হতে পারে, তারা বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি একটু জোরের সাথেই করে থাকে। অন্যদিকে যেসব মেয়ে নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করে, তারা যদি পরে বুঝতে পারে স্বামী অত্যাচারী বা অন্য কোনোভাবে সমস্যাজনক, তা-ও সহজে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ চায় না।

নারীদের শিক্ষা, চলাচল ও সেবা

বাংলাদেশে সাধারণভাবে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে এবং অভিভাবকদের মধ্যেও কন্যাসন্তানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও যথাযথ মনোযোগ বাড়ছে। তার পরেও অনেকের মধ্যে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অবমূল্যায়নের একটা প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বেলায়। অনেক সময় একটা বয়সের পর মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা অনেক বাবা-মাকে, বিশেষ করে তারা যদি নিম্নবিত্ত ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক হয়, মেয়েদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণেই হয়ত-বা সন্দ্বীপের মতো জায়গায় দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি।

শহর ও গ্রামাঞ্চল, উভয় পরিসরেই কেনাকাটাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার এবং ঘোরাফেরা করার মাত্রা বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন নারী তথ্যদাতা মন্তব্য করেন, 'আগে তো আমরা কিছুই জানতাম না। এখন আমরা বাজারে যেতে পারি। মাছের বাজার, স্কুল, ব্যাংক, যেখানে যাওয়া দরকার আমরা যাই। প্রয়োজন কেনাকাটা করা বা চিকিৎসা যেটাই হোক, আমরা সেভাবে যেখানে যাওয়া লাগে যাই'। তারা বিভিন্ন সেবার জন্য সরকারি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিওদের কাছে যখন যেখানে যাওয়া লাগে যায়। এলাকাবাসীর অনেকেরই প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা দলবেঁধে এবং বারবার যায়, যদি শুরুতে দু'একজন যাওয়ার পর কাজ না হয়। এভাবে সন্দ্বীপে একটা গভীর নলকূপের জন্য তিন বছর অপেক্ষা করে বহুবার তদ্বির করতে হয়েছিল সেখানকার স্থানীয়দের। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তারা প্রতিবাদও করে, যদি সেবা ঠিকমতো না পায় বা দুর্নীতির মুখোমুখি হয়। সব মিলিয়ে নারীদের অনেকের স্বাধীনভাবে চলাচলের ক্ষমতা ও নিজেদের ওপর আস্থা বেড়েছে। বারহাট্টার একজন নারী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আগে মৎস্য অফিস কোথায়, পশুর ডাক্তারখানা কোনদিকে, এসব কিছুই জানতাম না। এখন আমি স্বামীকে ছাড়াই এসব জায়গায় যেতে পারি'।

বাড়ির বাইরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

বাড়ির বাইরে নারীদের সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ ও গণ্ডি এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। নারীরা আত্মীয়স্বজনদের কাছে বেড়াতে যেতে পারে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা আলোচনাসভায় অংশ নিতে পারে; যেমন, মুসলমান নারীদের বেলায় সেসব ওয়াজ মাহফিল, যেখানে নারীদের আলাদা বসার ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দুদের বেলায় পূজা ও কীর্তন। তবে এসব ক্ষেত্রে সচরাচর সাথে পরিবারের পুরুষ সঙ্গী থাকে বা পাড়ার অন্যদের সাথে যাওয়া হয়। সন্দ্বীপে দেখা গেছে, পাড়ার মধ্যেই নারীরা অনেকে যৌথভাবে তালিমের আয়োজন করে এবং নারীদের বাইরে যাওয়াকে নিরুৎসাহ করা হয়। এসব তালিমের আয়োজকদের এ প্রসঙ্গে যে ধরনের যুক্তি দেখাতে শোনা যায়, তার একটা হলো এরকম, 'মেয়েরা হলো শাড়ির মতো। ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখা হলে সুন্দর থাকে, কিন্তু বাইরে রাখা হলে দেখতে খারাপ লাগে'। অবশ্য এ ধরনের যুক্তি যারা দেয়, তাদের কথা ও আচরণের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষণীয়। তারা নিজেরা অন্য নারীদের বাইরে যেতে নিরুৎসাহিত করে, কিন্তু নিজেরা তালিম দেওয়ার কাজে ঠিকই বাইরে ঘুরে বেড়ায়! এ কাজে অবশ্য সাংগঠনিকভাবে তাদের ঢাকা থেকে সহায়তা দেওয়া হয়। তবে যারা সে কাজ করে, তাদের কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা জানা যায় নি। তবে সংশ্লিষ্টতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত স্থানীয় নারীদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার জন্য বলা ও এনজিওরা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যেসব কর্মকাণ্ডে তাদের সহায়তা দেয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্রে যে এখন নারীদেরই একটা অংশ সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। আগে বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর পুরুষ রাজনীতিবিদদেরই এমন কথা বলতে দেখা যেত, কিন্তু এখন সেই ভূমিকার কিছুটা যে নারীদের একাংশও নিয়ে নিচ্ছে, তাতে মনে হয়, নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা যেমন বিস্তৃততর হচ্ছে, তেমনি এর প্রতি বিরোধিতার কারণ, কৌশল ও ধরনেও বৈচিত্র্য এসেছে।

এনজিওদের কার্যক্রমে যেসব নারী যুক্ত রয়েছে, তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশ, র‍্যালি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ বিরল নয়। এ ছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবাদে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও বিদ্যালয়ের মতো পরিসরে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। তাদের অনেকে আজকাল এমনকি সালিশেও ভূমিকা রাখে, যেটা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদ বা মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে নারীদের কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সম্পত্তির মালিকানা

মাঠকর্মের সময় দেখা গেছে যে, নারীদের মধ্যে সম্পত্তির মালিকানার হার খুব কম। নারীদের অনেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন বেশি সম্পদ পায় না, তেমনি নিজেদের অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কেনার মতো যথেষ্ট আয়ও তারা করে না। আর বিবাহিত নারীরা যারা কিছুটা আয় করে, তাদেরও নিজেদের আয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং এক্ষেত্রে স্বামীদের ভূমিকা থাকে যথেষ্ট। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্বামীর নামেই সম্পত্তি কেনা হয়। স্বামী সম্পদশালী হলে স্ত্রীর নামে কিছু সম্পত্তি কিনতে বা তাকে কিছু সম্পত্তি দান করে দিতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়। তবে আজকাল জমি কেনার সময় যদি নারীরা অর্থের জোগান দেয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের আংশিক মালিকানা দেওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মাঠকর্মের সময় অনেকেই বলছিলেন, স্বামী মারা গেলে তো স্ত্রী ও সন্তানরাই সম্পত্তির ভাগ পাবে,

কাজেই আগেভাগে স্ত্রীর নামে আলাদা করে সম্পত্তির মালিকানা দেওয়ার দরকার নেই। অনেকে আবার এ-ও বলেছেন, স্বামীরা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার পর ওরা যদি তাদের ছেড়ে যায়, তাহলে তাদের 'সব যাবে'!

বাংলাদেশে আইন অনুসারে মুসলমান নারীদের বাবা-মায়ের সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে প্রায় ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় না। এর দুটি প্রধান দিক আছে। একদিকে নারীদের অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের প্রাপ্য অংশ দাবি করে না। কারণ তারা মনে করে যে বিপদে আপদে ভাইয়েরা তাদের দেখবে। অন্যদিকে ভাইয়েরাও অনেকে বোনদের সম্পত্তির ভাগ দিতে চায় না এবং বোনেরা তাদের দাবি না ছাড়লে তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে। নেত্রকোনার কিছু জায়গায় জানা গেছে, কোনো নারী যখন পৈতৃক সম্পদের ভাগ চায়, তখন সেটাকে ভালো চোখে দেখা হয় না। কারণ এর একটা অর্থ হলো তার স্বামীর অবস্থা ভালো নয়। এসব জায়গায় এমন বিশ্বাসের কথাও জানা গেছে যে, নারীরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ নিলে তাদের স্বামীর সংসারে উন্নতির বদলে অভাব দেখা দিতে পারে। এসব কারণে নারীদের অনেকেই নিজেদের উত্তরাধিকারের দাবি ওঠায় না। তবে এই অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। অনেক জায়গায় জমির দাম এতটাই বেড়ে গেছে যে, সবাই বোঝে যত অল্প পরিমাণই হোক, এক খণ্ড জমি থাকলে তার আর্থিক মূল্য অনেক হবে। অন্যদিকে নিজেদের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকলে স্বামীরাও স্ত্রীদের চাপ দিতে পারে তার উত্তরাধিকারের দাবি না ছাড়ার জন্য।

অবশ্য নারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেলেও সেটার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কমই থাকে। যদি তারা সেই সম্পত্তি বেচে নগদ টাকা নিয়ে আসে, সে অর্থ অনেক ক্ষেত্রে স্বামীদের হাতে চলে যায়। তারা তা নিজের মতো করে খরচ করে ফেলতে পারে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কোনো হিসেবও রাখা হয় না। একইভাবে যেসব নারী নিজে আয় করে, তাদের সঞ্চয়ের ওপরও স্বামীরা ভাগ বসাতে চায় অনেক সময়। এ ছাড়া, এটাও দেখা গেছে, নারীরা যদি বেশ ভালো অংকের অর্থ জমাতেও পারে, কীভাবে তা খরচ করবে সে ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে এসব ব্যাপারে নারীদের সচেতনতা একটু হলেও বেড়েছে এবং এই পরিবর্তন চলছে। মাঠকর্মে যেসব তথ্য ও মতামত পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও মালিকানার ব্যাপারে নিজেদের পাওনা সম্পর্কে নীরব থাকার যে প্রবণতা নারীদের মধ্যে আগে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল, সেই নীরবতা একটু হলেও ভাঙতে শুরু করেছে।

যৌন হয়রানি ও নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশে জনপরিসরে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি (যেমন ইভটিজিং) ও সহিংসতা কম-বেশি সর্বত্রই বিরাজ করছে। বয়স, শ্রেণি, পেশা, এলাকা ইত্যাদি নির্বিশেষে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে নারীদের প্রায় সবাইকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়রানি বা সহিংসতার শিকার ব্যক্তি বা 'ভিকটিম' সামাজিক রীতিনীতির কারণে এবং লোকলজ্জার ভয়ে নীরব থাকে। আর এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপকতা ও সুশাসনের ঘাটতি, যার কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিত্তের জোরে অনেক অপরাধীই পার পেয়ে যায় বা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। অবশ্য এমন নয় যে শুধু বিশেষ বর্গের পুরুষ, যাদের ক্ষমতা ও বিত্তের জোর আছে, কেবল তারাই যৌন হয়রানি বা নারীর প্রতি সহিংসতায় বেশি তৎপর। বরং সাধারণভাবে দেখা যায়, নারীবৈরী পুরুষদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, শিক্ষা, বয়স নির্বিশেষে সকল ধরনের পুরুষই রয়েছে।

মাঠকর্মের সময় একটা উদ্বেগজনক প্রবণতার কথা জানা গেছে, সেটা হলো, বয়স্ক পুরুষদের হাতে বাচ্চা মেয়েদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা। এ বিষয়ে একজন কিশোরী বলে, 'অল্প বয়সের ছেলেরা জ্বালায় না, বরং বড়োরা আজেবাজে কাজ করে। অনেকে আছে বয়সে চাচা বা দাদার সমান হবে, কিন্তু সুযোগ পেলে গায়ে হাত দেয়। এটা খুব লজ্জার কথা, তাই বড়োদের বলা যায় না'। আর কখনো বড়োদের কাছে নালিশ করা হলে অভিযুক্তরাই উলটো বলে বসতে পারে, 'বাচ্চাদের কথা বিশ্বাস করার কী আছে?'।

যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে এর শিকার নারীরা আরো বহু বাস্তব কারণে প্রতিবাদ বা অভিযোগ করে না। এসব ঘটনা জানাজানি হলে তা ভুক্তভোগী ব্যক্তির জন্য তো বটেই, তার পরিবারের জন্যও লজ্জাজনক হিসেবে ভাবা হয়। আর প্রায়শই দেখা যায়, উলটো হয়রানির শিকার ব্যক্তির ওপরই দোষ চাপানো হয়। তার পোশাক-আশাক, আচরণ বা চলনবলনে খুঁত খোঁজা হয়। ফলে সব বয়সের নারীই অনেক ঘটনার কথা চেপে যায়, আর কিশোরীদের বেলায় তারা কিছু কথা সমবয়সী সাথী বন্ধুদেরও বলে না। বাবা-মায়েরা যদি জেনে যায়, তখন দেখা যায়, তারাও নিজেদের মেয়েকেই দোষ দেয় বা তাদের চলাফেরার সীমানা ছোট করে দেয়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাদের স্কুল বা কলেজে পাঠানোও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রাস্তাঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত বা অন্যভাবে যৌন হয়রানির শিকার হবার ঘটনা ঘটলে অনেক ক্ষেত্রেই আশপাশের লোকজন প্রতিবাদ না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। এর ফলে আক্রান্ত নারীরাও প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। তবে মাঠকর্মের সময় জানা গেছে, বেশ কিছু জায়গায় হয়রানি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধও গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চলছে। তাই কিছু জায়গায় রাস্তাঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনা এখন কম হয়, এমন তথ্যও জানা গেছে।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কারণে উত্ত্যক্তকারীদের পুলিশ ধরেছে, এমন ঘটনাও আছে। তবে সাধারণভাবে প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি যারা করে, তারা প্রায়শই স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী পরিবারের বখাটে ছেলে হয়ে থাকে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ চাইলেও অনেক সময় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে না। তবে খোদ পুলিশের বিরুদ্ধেই বিভিন্ন অভিযোগ শোনা গেছে মাঠকর্মের সময়। সাধারণভাবে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন অনেকে। আর যৌন হয়রানির শিকার নারীদের পক্ষে পুলিশে কখনো অভিযোগ করা হলে পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়ার কথাও জানা গেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে পুলিশের পক্ষ থেকে নাকি ঘটনাকে 'স্পেশাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং একজনকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে ভুক্তভোগীর বাসাতেই বারবার যেতে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যও অনেকে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার ব্যাপারে পুলিশে কাছে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে।

নারীদের উত্ত্যক্তকারী বখাটে ছেলেদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মায়েরা যেমন যথাযথ ব্যবস্থা নেয় না, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয় না। দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্তকারীরা হয়ত ঠিকমতো স্কুলে যায় না। ঢাকায় একটি যুবক দলের সাথে আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীরা জানায়, যারা স্কুলে নিয়মিত আসে না, তাদের নিয়ে শিক্ষকরা মাথা ঘামায় না। বরং অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জরিমানার বিনিময়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয় তারা। ফলে নারী উত্ত্যক্তকারী কিশোরদের মধ্যে যাদের বাড়িতে বা স্কুলে কোথাও কেউ কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করার পর পুলিশ যদি যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় বা ধরার পর ছেড়ে দেয়, তারা আচরণে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের প্রবণতার কথা মাঠকর্মের সময় উঠে এসেছে।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অবশ্য মাঠপর্যায়ের নারীদের মধ্যে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা লক্ষ করা গেছে। অনেকে প্রতিবাদ করার সাহস ও আত্মবিশ্বাসও অর্জন করছে। এরকম একজন নারী আলোচনাক্রমে জানান, একবার তাঁকে ও তাঁর সাথীদের উত্ত্যক্ত করা হলে তিনি উত্ত্যক্তকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমাকে আমি আমার স্যান্ডেল দিয়ে পিটাব'। এটা শুনে উত্ত্যক্তকারীদের একজন সঙ্গী নাকি বলেছিল, 'আপনি আমার মায়ের মতো। এখান থেকে যান'। এমন আলোচনার সূত্রে আরেকজন নারী যোগ করেন, 'আগে এসব বিষয় আমরা লজ্জার ব্যাপার ভাবতাম, প্রতিবাদ করতাম না। এখন আমরা প্রতিবাদ করি, অভিযোগ করি'। তবে একজন এর বিপরীত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমার প্রতিবাদ বা অভিযোগ করার মতো সাহস নাই। আমার স্বামী আছেন, শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন, তাঁরা কী মনে করেন, এই নিয়ে আমি ভয়ে থাকি'।

পারিবারিক সহিংসতার মিশ্র চিত্র

মাঠকর্মের সময় পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন ধরনের মতামত মিলিয়ে একটা মিশ্র চিত্র পেয়েছি। অনেকের মতে সহিংসতা কমেছে, আবার অন্যরা বলেছেন তা কমে নি, বরং এর ধরন এবং কারণ পালটেছে। যাই হোক, আমাদের তথ্যদাতাদের একটি বৃহৎ অংশই মনে করেন যে, সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগের কারণে সহিংসতা কিছুটা হলেও কমেছে বিভিন্ন পর্যায়ে, যার মধ্যে পরিবারের পরিসরও রয়েছে। তাঁরা আরো দাবি করেন যে, এক্ষেত্রে নিজ এলাকায় তাঁরা নিজেরাই সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

পারিবারিক পরিসরে ঝগড়া বিবাদ ও সহিংসতার পেছনে সচরাচর যেসব কারণের কথা জানা যায়, সেগুলোর মধ্যে যৌতুকের মতো বড়ো সামাজিক সমস্যা যেমন আছে, তেমনি রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা বা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার কাজে পারস্পরিক অসন্তোষের মতো 'তুচ্ছ' কারণও থাকতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদের বেলায় পরিবারের অন্য সদস্য বা প্রতিবেশীরা অনেক সময় মধ্যস্থতা করে সেসব মেটানোর চেষ্টা করে। 'বউ পেটানো' নিয়ে সমাজে সাধারণভাবে একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটায়, সমাজে তাদের খারাপ চোখে দেখা হয়। ফলে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে একটা মৃদু প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। তথাপি অনেকের বেলায় স্বল্পমাত্রার ঝগড়া এবং নিপীড়ন সারাক্ষণই চলে, যেগুলো বিভিন্ন সময় অধিকতর সহিংস রূপ নিতে পারে।

পুরুষ তথ্যদাতাদের মতে, বউরা স্বামীদের কথা না শুনলে, তারা একে অপরকে পছন্দ না করলে, সহিংসতার ঘটনা ঘটতে পারে। যৌতুকের বিষয়টাও তাঁরা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে পুরুষরা স্ত্রীদের দোষ খুঁজে বেড়ান, এমন অভিমত জানিয়েছেন চট্টগ্রামের একজন নারী তথ্যদাতা। সেখানে আলোচনার সময় বর্তমানে পারিবারিক অশান্তির অন্যতম কারণ হিসেবে মোবাইল ফোনের কথা উঠে আসে। বিশেষ করে স্ত্রীরা মোবাইল ফোনে বেশি সময় কাটালে, অপরিচিত লোকজনের সাথে কথা বললে, স্বামীরা সন্দেহ করা শুরু করে। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল। এ বিষয়ে নারীদের অনেকের বক্তব্য ছিল এমন যে, স্বামীদের ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতো জায়গা, আয় করার উপায়, নারীদের জন্য নেই বা থাকলেও সীমিত। তাদের ছেলেমেয়েদের কথাও ভাবতে হয়। আর বিবাহ বিচ্ছেদের

মধ্য দিয়ে যাওয়া নারীদের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। এসব নানা কারণে অনেক সময় নারীরা নীরবে পারিবারিক সহিংসতা সহ্য করে নিপীড়ক স্বামীর সাথেই ঘর করতে থাকে।

পারিবারিক সহিংসতার মাত্রা সম্পর্কে তথ্যদাতাদের মধ্যে বিভিন্ন অনুমান কাজ করে। কারো কারো মতে, বর্তমানে ২০ শতাংশ পরিবারে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আবার কেউ-বা মনে করেন, এ হার ৮০ শতাংশও হতে পারে। সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন, পারিবারিক পরিসরে নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশেষ করে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা, কমেছে এবং কমছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার একজন তথ্যদাতা মন্তব্য করেছিলেন, 'আগে পুরুষরা তাদের বউদের হাত দিয়ে মারত। এখন কথায় ও টাকায় মারে'। যেসব নারী নিজেরা ঘরের বাইরে কাজ করে না, তাদের স্বামীদের অনেকে আবার হয়ত মনে করে যে, 'আমি যেহেতু বউকে খাওয়াই পরাই, তাকে মারার অধিকার আমার আছে'। সরাসরি এমন ভাষায় অবশ্য কোনো তথ্যদাতা প্রকাশ্যে কিছু বলেন নি, তবে একজন কথা প্রসঙ্গে একটা মন্তব্য করেছিলেন, যা ছিল অনেকটা এমন, 'নিজের বউকে যে লোক খাওয়াতে পরাতে পারে না, সে কীভাবে বউ পেটায়?'। উল্লেখ্য, যেসব নারী আয় করে, তাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করতে গিয়ে অনেক স্বামী সহিংসতার আশ্রয় নেয়, এটাও জানা গেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রচলিত একটা ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেটা হলো এই যে, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা না থাকাতেই নারীরা অনেক সময় স্বামীদের অত্যাচার মেনে নেয়।

মাঠকর্মের সময় পাওয়া বিভিন্ন তথ্য ও মতামত পর্যালোচনা করে সাধারণভাবে বলা যায়, গবেষণা এলাকার স্থানীয় লোকজনের মধ্যে যৌন হয়রানি ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে সাধারণভাবে সচেতনতা বেড়েছে। বিশেষ করে এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার তৎপরতার ফলে বড়ো আকারের শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা কম ঘটে বলে তথ্যদাতাদের অনেকেই মনে করেন।

নারীর ক্ষমতায়নের পথে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর ক্ষমতায়নের বড়ো প্রতিবন্ধক, এমন বেশ কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে যেগুলো সবারই জানা এবং যেগুলো নিয়ে বহুকাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ হয়েছে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কিছু সমস্যাও যুক্ত হয়েছে, যেগুলোর প্রতিও নজর দেওয়ার দরকার রয়েছে। নতুন ও পুরোনো এ ধরনের বিবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে যৌতুকপ্রথা ও বাল্যবিয়ের হার প্রত্যাশিত হারে না কমা, মাদকের প্রসার, পরিবেশ দূষণ ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা। নিচে এ ধরনের কিছু বিষয় দুই ভাগে তুলে ধরা হলো : এক. তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের, বিশেষত নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা বিভিন্ন সমস্যা, যেগুলো লাঘব করা দরকার নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থে। দুই. এনজিওদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ, যেগুলো নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমন্বিত ও কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

স্থানীয় জনগণের দ্বারা চিহ্নিত বিবিধ সমস্যা

যৌতুক

সরকার ও বিভিন্ন এনজিওর নানা সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য উদ্যোগ সত্ত্বেও যৌতুক খুব বেশি কমেছে, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যৌতুকের দাবি না মেটানো হলে বিয়ের পরে কলহ থেকে স্ত্রীর

প্রতি প্রায়ই সহিংসতা দেখা যায়, এটা সুবিদিত। মাঠকর্মের সময় তথ্যদাতাদের অনেকে বলেছেন, এটা আগের মতোই চলছে, যদিও অনেকে আবার বলেছেন, যৌতুকের ব্যাপকতা একটু কমেছে। যৌতুক বলতে স্থূল অর্থে যা বোঝায় (বিয়ের সময় বরের জন্য রাখঢাক ছাড়াই কনেপক্ষ থেকে নানা কিছু চেয়ে নেওয়া), তা আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিচের দিকেই বেশি দেখা যায় বলে ধারণা করা হয়। তবে বিভিন্ন আকারে যৌতুকের মতো প্রবণতা সমাজের অন্যান্য স্তরেও কম বেশি দেখা যায়। যৌতুক হিসেবে ঠিক কী দেওয়া হবে, কখন কীভাবে সে দাবি মেটানো হবে, এসব বিষয় শ্রেণি, অঞ্চল ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন রূপে দেখা যেতে পারে। সন্দ্বীপে দেখা যায়, যৌতুকের সামগ্রী বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ার সময় ঠিক করা হয় এবং সে মোতাবেক খরচ করা হলে সে অর্থ পরে নগদ দেওয়া হয়, যাতে যৌতুকের বিষয়টা সামনে না আসে। সেখানকার লোকজন বলে থাকে, 'মেয়ে ফোটে না, টাকা খাটে'। একজন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জানান, যৌতুকের দরকষাকষির কাজ অনেক সময় মসজিদে নামাজের পর সেরে নেওয়া হয়। নেত্রকোনার হিন্দু সম্প্রদায়ের তথ্যদাতারা জানান, তাদের মধ্যে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ ছাড়াও স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি দেওয়ার চল আছে এবং এসব 'সাধারণ' জিনিসের কথা বিয়ের কথাবার্তার সময় উল্লেখেরও দরকার পড়ে না।

অবশ্য এটা জানা গেছে যে, পাত্রী যদি শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী হয়, সেক্ষেত্রে যৌতুক না হলেও চলে। এসব ক্ষেত্রে যৌতুক ছাড়াই বিয়ের প্রতি অনেকের যে আগ্রহ, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, চাকুরিজীবী নারীরা সংসারের জন্য দীর্ঘমেয়াদের একটা বাড়তি আয়ের উৎস। কিছু তথ্যদাতার ভাষায় 'সোনার ডিম পাড়া হাঁস'। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'যৌতুকহীন' বিয়েতে পাত্রের তুলনায় পাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আয়ের ক্ষমতা বা সম্ভাবনা বেশি, যে বিষয়টিকে তথ্যদাতাদের অনেকে পরোক্ষ যৌতুক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

নতুন ও পুরোনো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিভিন্ন উপায়ে যৌতুকের চর্চা ব্যাপক পরিসরে অব্যাহত থাকার প্রসঙ্গে মাঠকর্মের সময় আমাদের সাক্ষাৎদাতা ইউনিয়ন পরিষদের একজন জনপ্রতিনিধির মতে, এই অবস্থার জন্য এনজিওরাও কিছুটা দায়ী। তিনি মনে করেন, যৌতুকের বিরুদ্ধে এনজিওরা ব্যাপক প্রচার চালানোয় এ সম্পর্কে আগে তেমন জানত না এমন লোকজনও চর্চাটার কথা জানতে পারে। তাদের অনেকে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অভিযোগটি যদি সত্য না-ও হয়, এতে একটা বিষয় ফুটে ওঠে যে, শুধু প্রচারণার মাধ্যমে যৌতুকের মতো বহুদিনের পুরোনো একটি সামাজিক সমস্যা দূর করা যাবে না।

বাল্যবিয়ে

বাংলাদেশে বহুকাল ধরে চলে আসা আরেকটি সামাজিক সমস্যা বাল্যবিয়ে, যেটি রোধ করার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার সাথে এনজিওরাও যুক্ত রয়েছে। মাঠকর্মে দেখা গেছে, বাল্যবিয়ের মাধ্যমে অল্প বয়সের মেয়েদের যেসব ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়, সেসব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। ফলে বাল্যবিয়ের ঘটনা নজরে এলে সেটির ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানোর কাজেও অনেকে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে অবহিত হলে কর্তৃপক্ষও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। এসবের ফলে বাল্যবিয়ের হার যথেষ্ট কমে এসেছে বলে মনে করা হয়।

তবে বাল্যবিয়ের ব্যাপকতা বা প্রকাশ্য চর্চা কমে এলেও তা পুরোপুরি দূর হয় নি, বরং এখনো গোপনে ঠিকই চলছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে কাগজে কলমে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্রীর বয়স বেশি দেখিয়ে বিয়ের কাজ

সম্পন্ন করা হলো একটা সাধারণ কৌশল। এ বিষয়ে জানা গেছে, বয়সের সনদ দেওয়ার ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের জন্য সরকার কঠোর নিয়ম করাতে অভিভাবকরা এখন ডাক্তারদের শরণাপন্ন হচ্ছে, যাদের অনেকে অর্থের বিনিময়ে বয়সের সনদ দিয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে আবার অভিভাবকরাও ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়। তারা ডাক্তারদের সামনে প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারীকে দেখিয়ে নাবালিকা মেয়ের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সনদ নিয়ে আসে। এভাবে ডাক্তারের সনদ আনা গেলে ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে বয়সের সনদ পাওয়াও সহজ হয়ে যায়। এ ছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য বাধা এড়ানোর জন্য অভিভাবকরা অনেক সময় নিজ এলাকা থেকে দূরে গিয়ে চুপিসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ের কাজ সেরে ফেলে।

মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে কথা বলে যেটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে তা হলো, মেয়ের বয়স যাই হোক, একবার তার বিয়ে হয়ে গেলে এ নিয়ে তেমন কেউ আর মাথা ঘামায় না। বাল্যবিয়ে রোধ নিয়ে যত কথা হয়, সে তুলনায় লুকোচুরি ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে কোনো পরিবার যদি নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ের কাজ সেরে ফেলে, সেই বিয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহও দেখা যায় না। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, যেভাবে কিশোরীদের রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করা হয় এবং যৌন সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে চলাফেরা করতে হয়, তাতে তাদের অনেকের মনে হতে পারে, 'তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই ভালো'। এমন দৃষ্টিভঙ্গি টিকে থাকার বাস্তব প্রেক্ষাপট হিসেবে দুর্নীতি, প্রভাবশালীদের দাপট ইত্যাদি প্রসঙ্গ চলে আসে। এই প্রেক্ষাপটে বাল্যবিয়ের ব্যাপকতার পেছনে যেসব গভীর কারণ রয়েছে, সেগুলোকে আমলে নিয়ে আরো মৌলিক জায়গায় সংশ্লিষ্ট সবার কাজ করার অনেক কিছু আছে।

মাদকাসক্তি

গবেষণা এলাকাগুলোর প্রায় সবখানে একটা প্রধান সমস্যা হিসেবে যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তা হলো মাদকাসক্তির প্রসার। এটির সাথে রাস্তাঘাটে বা কর্মক্ষেত্রে নারীদের উত্ত্যক্ত ও হয়রানি করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে সংঘটিত সহিংসতার একটা যোগসূত্র আছে বলে তথ্যদাতাদের অনেকেই মনে করেন। জানা গেছে, মাদকাসক্তি শুধু তরুণদের মধ্যেই সীমিত নয়, এটা অন্যান্য বয়সের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সবাই চিন্তিত। সবাই জানে, কারা মাদক সেবন করে এবং কারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত। তবু কেউ কিছু করতে পারছে না। তথ্যদাতাদের মতে, মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পুলিশ ও রাজনীতিবিদরা টাকা পান এবং এ কারণে মাদকাসক্তির প্রসার রোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

মাঠকর্মের সময় কিছু কমিউনিটি ফোরাম সদস্য জানান, মাদকাসক্তি একটা বড়ো সমস্যা হলেও এনজিওরা এটা নিয়ে কাজ করে না এবং স্থানীয় লোকদেরও এ ব্যাপারে কিছু করতে উৎসাহ দেয় না। তাদের মতে, এর পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে : এক. মাদকাসক্তি নিয়ে কাজ করা হয়ত তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না বা এজন্য তারা ফান্ড পায় না; দুই. এনজিওরা চায় না মাদকাসক্তির পেছনে থাকা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সাথে বিরোধে জড়াতে। তবে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে এনজিওদের প্রত্যক্ষ বা ব্যাপক কোনো কার্যক্রম না থাকলেও কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের কথা জানা গেছে; যেমন, নেত্রকোনায় বিএনপিএস-এর প্রকল্পসংশ্লিষ্ট একটি যুবক দল মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে একটা র‍্যালির আয়োজন করেছে।

বহুবিবাহ

মাঠকর্মে জানা গেছে, পুরুষদের একসাথে একাধিক বিয়ে করার প্রবণতা অনেক জায়গায় এখনো রয়েছে, যদিও মাত্রাটা অতীতের তুলনায় কিছুটা কম। এ ব্যাপারে কথা বলার সময় ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের কিছু জনপ্রতিনিধি জানান, পারিবারিক কলহের একটা বড়ো কারণ হলো পুরুষদের বহুবিবাহ, যখন কেউ একজন স্ত্রী থাকা অবস্থায়ও আবার বিয়ে করে। এ বিষয়ে জানা গেছে, যারা কাজের জন্য অভিবাসী হয়, পরিবার থেকে দূরে থাকে, তাদের বেলায় এই প্রবণতা বেশি।

পরিবেশ দূষণ

তথ্যদাতাদের অনেকে বলেছেন, পরিবেশ দূষণ একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা গ্রাম ও শহর, দুই পরিসরেই দেখা যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রসারের ফলে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করছে। দরিদ্র পরিবারগুলোকে দূষিত পরিবেশে বাস করতে হচ্ছে। এর ফলে যেসব রোগব্যাধি দেখা যায়, তার ধকল সেসব নারী ও শিশুদের বেশি পোহাতে হচ্ছে, যাদের সারাক্ষণ বিষাক্ত জল-হাওয়ার মধ্যে থাকতে হয়।

চিকিৎসাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণের দৃষ্টিতে, বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অকার্যকরতা একটা বড়ো সমস্যা। যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সেবার মান সাধারণত বেশ খারাপ বলে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী যেমন নেই, তেমনি ডাক্তারের সংখ্যাও সীমিত। যারা আছে, তারাও সবাই নিয়মিত নয়। অনেকে আবার সরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্রেফ নিজেদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খদ্দের ধরার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করে। তা ছাড়া, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সনদ ছাড়াই অনেকে অবৈধভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার কাজ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে।

মাঠকর্মের সময় যাদের সাথে আলাপ হয়েছে, দেখা গেছে তাদের মধ্যে নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) সম্পর্কে মোটামুটি সচেতনতা রয়েছে; যেমন, অনেকেই জানেন, গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে যথাসময়ে যথাযথ সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। কিশোরীদের বেলায় বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রয়োজনে যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার গুরুত্বও অনেকে উপলব্ধি করেন। তবে এ ধরনের তাগিদের পাশাপাশি বিদ্যমান সেবাব্যবস্থার অপ্রতুলতা নিয়ে যথেষ্ট হতাশা ও অসন্তোষ রয়েছে। এসবের একটা বড়ো কারণ হিসেবে আবারো দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাবের কথা চলে এসেছে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের বক্তব্যে।

মাঠপর্যায়ে জনগণের দুর্বল কণ্ঠস্বর

এই গবেষণার আওতায় তথ্যসংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে যেসব জায়গায় যাওয়া হয়েছে, সেগুলোতে সবখানেই প্রকল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নারী দল ও কমিউনিটি ফোরামকে অভিন্ন কিছু সমস্যা নিয়ে কাজ করতে দেখা গেছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিয়ে এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার মতো বিষয়। কিন্তু এসব বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে তাদের বক্তব্য ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু বাধা চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে যাদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে, সবাই বলেছেন যে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না এবং তাদের খুব একটা দায় নেই স্থানীয় জনগণের প্রতি।

স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের সমস্যার কথা ভালো করে জানা ও বলার দিকে তাদের মন নেই। বরং তাদের লক্ষ্য থাকে যে কোনোভাবে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া, তাহলে টাকা খরচ করে ও পেশিশক্তির সাহায্যে তাঁরা নির্বাচিত হতে পারেন সহজেই। এই বাস্তবতায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি এবং ক্ষমতাসীনদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে গিয়ে কথা বলার মতো সংগঠিত অবস্থায় স্থানীয় জনগণ নিজেদের দেখতে পায় না।

উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে ভাবেন, এমন তথ্যদাতাদের মধ্যে বারহাট্টার একজন কমিউনিটি ফোরাম সদস্য জানান, 'আমরা যদি ওদের (মানে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি লোকজন ও স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের) বিরুদ্ধে যাই, তাহলে এলাকায় আমরা টিকতে পারব না'। এসব কারণে এনজিওদের সহায়তায় কাজ করতে গিয়ে অনেকে তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বেশি নজর দেন। তবে নারী তথ্যদাতাদের বক্তব্যে যে বিষয়টা সামনে এসেছে তা হলো, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো বিষয়ের আগে তাদের ঘরে ও সমাজেও অনেক বাধা ডিঙাতে হয় নারী হিসেবে। অন্যদিকে যেসব নারী জনপরিসরে কথা বলার মতো জায়গায় পৌঁছান, তাদের জন্যও রয়েছে বাধা; যেমন, মাঠকর্মে ইউনিয়ন পরিষদের যে নারী সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, তাদের পরিষদে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য বাজেটে কোনো আলাদা বরাদ্দও থাকে না।

এনজিওদের ভূমিকা ও তাদের কাজের ধরন

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে বিএনপিএস ও অন্য এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে যেসব ছোট ছোট দল করেছে, তাদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও তৎপরতা অনেকাংশে স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে; যেমন, যেসব ইয়ুথ গ্রুপ রয়েছে, অনেক জায়গাতেই সেগুলো ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা করে গঠন করতে হয়েছে। সন্দ্বীপে ছেলেমেয়েদের একসাথে বসানো কঠিন কাজ। সেখানে মাঠকর্মের দলীয় আলোচনার সময় মেয়েরা প্রায় কোনো কথাই বলে নি। তাদের তুলনায় নেত্রকোনার দু'একটি জায়গায় মেয়েদের অনেক সক্রিয় দেখা গেছে। তবে এ ধরনের স্থানীয় পর্যায়ের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ভালো করে তলিয়ে না দেখেই এনজিওদের কাজের ছক সচরাচর একইভাবে সাজানো হয় সব এলাকার জন্য।

আমাদের আরেকটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ হলো, এনজিওদের সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে গঠিত স্থানীয় জনগণের যেসব ছোট দল সক্রিয় রয়েছে, তাদের কার্যক্রম সচরাচর খণ্ডিত আকারে ও সীমিত পরিসরেই পরিচালিত হয়। বৃহত্তর সামাজিক মতাদর্শিক বিষয় নিয়ে কাজ করার, বিভিন্ন বিষয়ে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মতো করে সংশ্লিষ্ট দলসমূহের বৃহত্তর কোনো জোট বা মঞ্চে আসার/আনার প্রয়াস খুব একটা চোখে পড়ে না। একই ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যায় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার নিজেদের মধ্যকার যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও। তাদের মধ্যে অভিন্ন লক্ষ্যে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা দেখা যায় না। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব প্রকল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ড রয়েছে, সেগুলোকে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতি রেখে নতুন করে সাজিয়ে বাস্তবায়নের মতো যথেষ্ট নমনীয়তা ও সৃজনশীলতাও মাঠপর্যায়ে দেখা যায় না।

নারীর ক্ষমতায়নের মতো লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা থেকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা, সবকিছুর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং কার্যকর যোগাযোগ

ও অন্যান্য দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সুচিন্তিত হওয়া দরকার। এ ছাড়া, নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে লেগে থাকা, আগের কাজের ফলাফল কী হলো তা খতিয়ে দেখা, কোথায় নতুন করে আবার মনোযোগ দিতে হবে তা দেখা, বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ থেকে কী শেখা গেল এসব লিপিবদ্ধ করা, অর্জিত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদির দরকার আছে। এসবে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে বলে গবেষকদের মনে হয়েছে মাঠকর্মে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য ও পর্যবেক্ষণ জড়ো করে।

উপসংহার

গবেষণায় উঠে আসা মূল বিষয়সমূহ

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, পর্যালোচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক দিক থেকে নারীদের ভূমিকা ও ক্ষমতায়নে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে অর্থনীতির পরিসরে। এরপর পরিবর্তনের মাত্রা অনুসারে রয়েছে যথাক্রমে রাজনৈতিক খাত ও সামাজিক পরিসর।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের নারীরা একদিকে যেমন রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের মতো খাতে বড়ো ভূমিকা রাখছে, তেমনি কৃষির মতো সনাতনী খাতেও নতুন বা সম্প্রসারিত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে নারীদের একটা বড়ো অংশের অর্থনৈতিক ভূমিকা এখনো গার্হস্থ্য পরিসরেই সীমিত। যারা বাড়ির বাইরে কাজ করে, তাদেরও এখনো ঘরের কাজ সামলানোর দায়িত্ব নিতে হয়। সাধারণভাবে নারীদের কাজের ধরন ও মাত্রা নির্ভর করে বয়স, বৈবাহিক মর্যাদা, শিক্ষা, শ্রেণি, গোষ্ঠীগত পরিচয়, অঞ্চল ইত্যাদির ওপর। তুলনামূলকভাবে গ্রামের চেয়ে শহরের নারীরা অধিক হারে আয়মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে বা ছোট শহরে নারীরা এখনো ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই তাঁদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে শ্রেণির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাসের একদম নিচের দিকে যেমন, তেমনি একেবারে উঁচুতেও নারীর চলাফেলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের শৃঙ্খলটা একটু শিথিল মনে হয়। তবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিতেও কিছুটা পরিবর্তন আসছে। আর সাধারণভাবে বলা যায়, বিদ্যমান বিভিন্ন বাধা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই বেড়েছে সার্বিকভাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রায়ও কিছুটা পরিবর্তন চলে আসছে, যদিও তা হয়ত একটু ধীরগতিতে। যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একটা আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাজনীতিতে লিঙ্গীয় সমতা অর্জনের পথে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে ভালোই অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে নারীদের থাকার মতো সূচক অগ্রগতির পরিমাণগত মাত্রাকে উপরে ঠেলে দেওয়ায় তার প্রভাব সার্বিক অবস্থানের ওপরও পড়েছে। অন্যথায় ব্যাপকতর পরিসরে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো বেশ সীমিত। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ, সবখানে সংরক্ষিত আসনে নারী জনপ্রতিনিধিরা থাকলেও সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি সব স্তরেই বিরল। অন্যদিকে সংরক্ষিত আসনে যে নারী প্রতিনিধিরা আছেন, তাঁদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এমন অভিযোগ আছে। সাধারণভাবে রাজনৈতিক দলগুলোতেও নারীদের অংশগ্রহণ এখনো খুবই সীমিত। অবশ্য এনজিও কর্মকাণ্ড রয়েছে, এমন এলাকাগুলোতে সালিশের

মতো কিছু পরিসরেও এখন নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়, যা আগে সেভাবে ছিল না। এভাবেই বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিসরে নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের পরিধি ধীরগতিতে হলেও বেড়ে চলেছে।

পরিবার ও সমাজের পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আমরা একটা মিশ্র চিত্র দেখতে পাই। পরিবারে বা বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা এখনো পুরুষদের তুলনায় অনেক সীমিত। পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর মতামত নিতে হয়, কিন্তু এর উলটোটা সব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও নারীদের এখনো পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক বিভিন্ন আইন, প্রথা বা চর্চার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। তবে ছোটখাটো বিভিন্ন পরিবর্তনের আলামতও দেখা যায়; যেমন, পোশাকশিল্পে কর্মরত কিছু নারীর স্বামী এখন ঘরের কাজে যথেষ্ট সময় দেন। যদিও সংশ্লিষ্টদের অনেকেই এই ব্যবস্থাকে 'সাময়িক' বলেই মনে করে। ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বৃদ্ধির বিষয়ও আছে। অন্যদিকে আবার নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানির ব্যাপকতা, নিরাপত্তাহীনতার অভাব ইত্যাদি কারণে নারীর চলাফেরার গণ্ডিটা অনেকে ছোট রাখতে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা হয়ে আছে, এমন বিবিধ সমস্যার মধ্যে কিছু আছে পুরোনো, আবার কিছু অপেক্ষাকৃত নতুন। উদাহরণ হিসেবে বাল্যবিয়ে ও যৌতুকের কথা উল্লেখ করা যায়, যেগুলো বহু পুরোনো সমস্যা এবং কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু এখনো নির্মূল করা যায় নি। অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ ও মাদকাসক্তির মতো প্রবণতাও আছে, যেগুলো তুলনামূলকভাবে নতুন সমস্যা। তবে সেগুলোও বিভিন্নভাবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে আছে। এ ধরনের বাস্তবতার মধ্যেই অবশ্য এনজিওসহ আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। তবে তাদের মধ্যে সমন্বয় ও কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক নিশ্চিত করা গেলে সার্বিকভাবে সবার কাজ আরো ফলপ্রসূ হবে।

বিভিন্ন পক্ষ থেকে আসা কিছু সুপারিশ

মাঠকর্মের সময় তৃণমূল পর্যায়ের লোকজন থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এনজিওকর্মী প্রভৃতি ভূমিকায় থাকা বিভিন্ন জন যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন, সেগুলোর কিছু বাছাই করা নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো মোটাদাগে তিনটি ভাগে। তবে যে ক্রমে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা অগ্রাধিকারনিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোনো পক্ষ কর্তৃক আরোপিত গুরুত্বের ক্রমানুসারে এ তালিকা সাজানো হয় নি।

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কাজ

১. বিনা পারিশ্রমিকে নারীদের করা ঘরের সব কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া (যেমন, সরকারি পরিসংখ্যানের বেলায়);

২. যেসব নারী পণ্য উৎপাদন করেন ও বিভিন্ন ধরন ও আকারের ব্যবসায় নিয়োজিত, তাঁদের জন্য অধিক হারে ও সহজতর উপায়ে বাজারে প্রবেশের ব্যবস্থা করা;

৩. রাজনীতিতে নারীদের অধিকতর ও কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া (যেমন, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচনে নারীপ্রার্থীদের বেলায় যোগ্যতার মাপকাঠি ভিন্নভাবে নিরূপণ করা);

৪. উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষ সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা;

নারীবান্ধব নাগরিক সুবিধাদি ও মৌলিক সেবা নিশ্চিতকরণ

৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারীদের নিরাপদে চলাচলের সুবিধার্থে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬. সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান বাড়ানো এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় বৈষম্য বিরোধী ও নারীবান্ধব বিভিন্ন মাত্রা যোগ করা;

৭. সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পরিমাণ ও মান বাড়ানো এবং ডাক্তার ও নার্সদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা; বিশেষ করে, তাঁদের কাছে নারীরা যেন যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সেবা পান, সেটার নিশ্চয়তা বিধান করা;

৮. সরকারি সেবাখাতে দুর্নীতি রোধ করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৯. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রসার ঘটানো; বিশেষ করে, যেসব বিষয় নারীদের ক্ষমতায়নে অন্তরায় হয়ে আছে, সেগুলো দূরীকরণে বিশেষ নজর দেওয়া;

এনজিওদের ভূমিকা ও কর্মসূচিতে উন্নতির জায়গা

১০. একটা পূর্বনির্ধারিত ছকে সকল এলাকার জন্য একই কর্মসূচি প্রণয়ন না করে, স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া;

১১. তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ও এনজিওদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক ও কৌশলগত সহযোগিতা নিশ্চিত করা, যাতে সবাই বিভিন্ন বিষয়ে এক স্বরে জোরে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে এবং সবার কাজের মধ্যে ফলপ্রসূ সমন্বয় ঘটে;

১২. এনজিওর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শুধু নারীদের প্রতি বেশি নজর না দিয়ে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরও আরো অধিক হারে সম্পৃক্ত করা, যাতে তাদের মধ্যে লিঙ্গীয় বিষয়াদিতে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

১৩. স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহের সভা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা ও জেন্ডার সচেতনতা বাড়ানো, যাতে নারীরা সহজভাবে কথা বলতে ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশ নিতে পারেন।

আইনুন নাহার অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ainoon.naher@gmail.com

আবু আলা মাহমুদুল হাসান মুক্ত গবেষক
abualahasan@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. প্রথম আলো (২০১৬) গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান ৫৩ শতাংশ, পুরুষের ৪৭ শতাংশ। *প্রথম আলো*, ২৭ অক্টোবর, ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/economy/article/1008719/

২. Ahmed, Nazneen (2016), Do political parties support women's political empowerment? *The Daily Star*, March 12, 2016.

৩. Azim, Firdous & Sultan, Maheen (Eds.) (2010), *Mapping Women's Empowerment: Experience from Bangladesh, India and Pakistan*. Dhaka, Bangladesh: BDI and University Press Limited

৪. Batliwala, S. (1994), The meaning of women's empowerment: new concepts from action. In *Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment, and Rights*, Sen G, Germain A, Chen LC (eds). Boston: Harvard Center for Population and Development Studies

৫. BBS (2017), *Statistical Pocketbook of Bangladesh-2016*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Department of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

৬. BBS (2012), *Statistical Yearbook of Bangladesh-2011*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Department of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

৭. Cornwall, Andrea and Eade, Deborah (Eds.) (2011), *Deconstructing Development Discourse: Buzzwords and Fuzzwords*. Rugby, UK: Practical Action Publishing

৮. Cornwall, Andrea (2016), Women's empowerment: what works? *Journal of International Development*, 28, p.342–359. Published online 28 March 2016 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/jid.3210

৯. Dannecker, Petra (2002), Conformity or Resistance? Women Workers in the Garment Factories in Bangladesh. UPL: Dhaka

১০. Efroymson, Debra; Ahmed, Julia; Ruma, Shakila (2013), *The Economic Contribution of Women in Bangladesh Through their Unpaid Labour* [2nd Edition]. WBB Trust-Health Bridge, Bangladesh

১১. FAO (2013), *Women in Agriculture: Data Requirements and Availability*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

১২. Firoj, Jalal (2003), Study Report on Women in the Fifth and Seventh Parliaments of Bangladesh: A Study on Opinion of Women Members of Parliament (MPs). http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacn905.pdf [Accessed on 8 March 2017]

১৩. Hamid, Shamim (1996), *Why Women Count: Essays on Women in Development in Bangladesh*. Dhaka, Bangladesh: UPL

১৪. Huq, Lopita (2013), *Review of Literature on Unpaid Care Work Bangladesh* [BDI Research Report 4]. Dhaka: Centre for Gender and Social Transformation (CGST) and BRAC Development Institute (BDI), BRAC University.

১৫. Islam, Mohammad Samiul (2014), Women's Empowerment in Bangladesh: A Case Study of Two NGOs, Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS); BDRWPS 23 (September 2014); http://www.bangladeshstudies.org/files/WPS_no23.pdf

১৬. Jahan, Rounaq (1995), *The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in Development.* Dhaka, Bangladesh: University Press Limited

১৭. Kabeer, Naila (2012), Women's economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development, SIG Working Paper 2012/1, Department for International Development (DFID) and the International Development Research Centre (IDRC).

১৮. Khan, Md Sahed, Begum, Flora, Islam, Md Mon‡jvurul (2017), A review on feminization of agriculture and women empowerment in Bangladesh, *Fundamental and Applied Agriculture*, 2017, 2(1):183-188

১৯. Mahmud, Simeen and Sakiba Tasneem (2011), *The Under Reporting of Women's Economic Activity in Bangladesh: An Examination of Official Statistics* [BDI Working Paper No. 1]. Dhaka: BRAC Development Institute (BDI), BRAC University.

২০. Mohsin, Amena (2010), Coming out of Private: Women forging voices in Bangladesh. In *Mapping Women's Empowerment: Experience from Bangladesh, India and Pakistan*, ed. Azim, Firdous & Sultan, Maheen. Dhaka, Bangladesh: BDI and University Press Limited

২১. Naher, Ainoon (2008), *Gender, Religion and Development in Rural Bangladesh: An Examination of 'Fundamentalist' Backlash against Women's Participation in NGO Activities in the Early 1990s*. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller.

২২. Naher, Ainoon & Hasan, Abu Ala Mahmudul (2015), *Unaccounted work of Indigenous women at Chittagong Hill Tracts*. Dhaka, Bangladesh: Manusher Jonno Foundation

২৩. Sen, Gita (1997), Empowerment as an approach to poverty. *Working Paper Series* 97.07 [Background paper for the UNDP Human Development Report]. New York: UNDP

২৪. Sholkamy, Hania (2010), Power, politics and development in the Arab context: or how can rearing chicks change patriarchy? *Development* 53(2): 254–8

২৫. Sultan, Maheen (2010), Work for Pay and Women's Empowerment: Bangladesh. In *Mapping Women's Empowerment: Experience from Bangladesh, India and Pakistan*, ed. Azim, Firdous & Sultan, Maheen. Dhaka, Bangladesh: BDI and University Press Limited

২৬. White, Sarah C (1992), *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh*. Dhaka, Bangladesh: University Press Ltd.

২৭. World Economic Forum (2014), *The Global Gender Gap Report.* Geneva, Switzerland: World Economic Forum [Soft copy from http://archive.dhakatribune.com/]